একক ১ ❐ সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.৩ পশ্চিম ইউরোপের সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন
১.৩.১ শিল্পবিপ্লব
১.৩.২ ফরাসী দেশের বৌদ্ধিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব
১.৪ বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লব
১.৫ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের কতিপয় বিশিষ্ট সমাজ চিন্তানায়ক / সমাজ দার্শনিক
১.৬ সারাংশ
১.৭ অনুশীলনী
১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত সম্পর্কে যথাসম্ভব স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।
- কিভাবে সমাজতত্ত্বের জন্মকাল ইউরোপের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তা জানা যাবে।
- জানা যাবে যে প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, অর্থশাস্ত্র বিশারদ, সমাজ দার্শনিক প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত পণ্ডিতগণ সমাজতত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করেছে।
- অষ্টাদশ শতকের নানাবিধ সমাজবিপ্লবের সঙ্গেও যে সমাজতত্ত্ব গঠন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল সেটা বুঝতে পারা যাবে।
- এটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে যে সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা চিন্তা গড়ে ওঠার মূলে ছিল পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লবজাত সামাজিক ভাঙন ও সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া।

১.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক মানুষ সমাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এটা বলা বাহুল্য মনে হয়। মানুষ তার জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে সমাজ প্রসঙ্গ নিয়েও ব্যস্ত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। প্রাচীনকালে প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে যেখানেই মানুষ উন্নত জীবনমান প্রদর্শন করেছে সেখানেই তার সমাজ ভাবনার ও পরিচয় মিলবে। তবে কিনা ঐ সময়ে সমাজভাবনা বা সমাজদর্শন কোনো বিজ্ঞানসম্পত পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

উপরন্তু, প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে সমাজসংক্রান্ত যে সব চিন্তার খোঁজ পাওয়া যায় সেগুলি রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে মিলিতভাবে উপস্থাপিত। একেবারে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে 'সমাজ' নিয়ে আলোচনা একান্তই আধুনিক কালের ঘটনা। তাই আধুনিক পৃথিবীর শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিক পর্যায়টিকেই আমরা সমাজতত্ত্বের উৎপত্তির কাল হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ যখন 'civil society' বা সমাজের স্বতন্ত্র সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন, তখন থেকেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনবিংশ শতকের গোড়ায় যে সব মানুষ সমাজ সংক্রান্ত দার্শনিক, বিজ্ঞানসম্মত, চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন তারা ছিলেন প্রধানতঃ ফরাসী দেশের মানুষ। সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনে ফরাসী দেশকেই অগ্রগণ্য বলা যায়। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড ও জার্মানির চিন্তানায়করাও এই বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান অবদান রেখেছেন। বর্তমান এককটিতে প্রথমে আমরা অষ্টাদশ শতকের নানাবিধ বিপ্লবের পরিণতির কথা নির্দেশ করে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করব। অতঃপর ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের বৌদ্ধিক বিপ্লবের উল্লেখ করে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আবির্ভাবের স্থান-কাল সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারনা অর্জনের চেষ্টা করব।

১.৩ পশ্চিম ইউরোপের সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ এর দশকে সমাজতত্ত্ব নামটি চয়ন করেন বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী **আগস্ত কঁত্**। আনুষ্ঠানিকভাবে ওই সময়টাই সমাজতত্ত্বের জন্মকাল বলে নির্দেশ করা হলেও তার পটভূমির খোঁজে আরোও অন্তত একশ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়টাকেই অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বকেই সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব-কাল বলে চিহ্নিত করা সঠিক। ঐ সময়ে পশ্চিম ইউরোপে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। ঐ সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সমাজকে যেন আগাগোড়া পাল্টে দিয়েছিল। ইউরোপের মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ওইসব যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্যতম উৎস হল শিল্পবিপ্লব যা ইউরোপের সামন্তযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের সূচনা করে।

পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁস ইউরোপীয় সমাজে আধুনিকতার সঞ্চার করলেও তখনই ইউরোপীয় সামন্তবাদ নিশ্চহ্ন হয়ে যায়নি। আরোও প্রায় তিনশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি যখন শিল্পবিপ্লব শুরু হল তখনই সামন্ত সমাজের অন্তিমলগ্ন প্রকট হ'ল বলা যায়। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি জার্মানিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজচিন্তার উপোযোগী নিত্যনূতন রসদের যোগান দিয়েছে। ধীরে ধীরে স্বতন্ত্রভাবে পৌরসমাজের চেহারা-চরিত্র বিশ্লেষন, সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থার অনুধাবনা, সমাজের ভারসাম্য বিনষ্টকারী প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সমাজচিন্তা বিশ্লেষণ এর সূত্রপাত হতে থাকে। সমস্ত সমাজ এর ধারাগুলো অতিক্রম করে কিভাবে আধুনিক পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সমাজ জীবনধারা গড়ে উঠেছে তার রূপরেখা প্রকাশ পেতে থাকে।

সাধারণভাবে যে কোন সমাজই হ'ল এক বহমানতা, আন্তঃমানবিক সম্পর্কের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রবাহ-প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালে ভিন্ন গতিসম্পন্ন হবে। উপরন্তু এই প্রবাহ-প্রক্রিয়া দেশ-কাল ভেদে ভিন্নতর ও বিবিধ সমস্যার প্রকাশ ঘটাবে। শিল্পবিপ্লব চলাকালীন পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাশীল মানুষেরা নানাবিধ

নতুন সমস্যা ও তাদের গুরুত্ব স্বতন্ত্রভাবে উপলিব্ধ করে তাদের বিচার বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। স্বভাবতই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রাথমিক গঠন ও প্রকৃতি বুঝতে হলে প্রথমেই শিল্পবিপ্লব নামক ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে কি অবস্থায়, কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হল সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই তো এক ধরনের সমাজতত্ত্ব। অতঃপর সেই বিপ্লবের পরিণতিগুলোর ব্যাখ্যাও সুসংবদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনাকে নির্দেশ করবে।

১.৩.১ শিল্পবিপ্লব

সাধারণ মানুষ শিল্পবিপ্লব বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগকে নির্দেশ করে। সন্দেহ নেই যে অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং নতুন উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করেছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লব-এর 'বৈপ্লবিক' চোহারাটি প্রকাশ পেয়েছে প্রধানতঃ শিল্পকর্মের "পদ্ধতিগত" পরিবর্তনের মধ্যে। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে 'কারখানা ব্যবস্থার' (Factory System) প্রবর্তনই হ'ল শিল্পকর্মে বিপ্লব। অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটি প্রকাশ পেয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান কারখানা ভিত্তিক উৎপাদনকর্ম পরিচালনার মধ্য দিয়ে।

অতীতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা অল্প কিছু মানুষের শ্রম নির্ভর যে ক্ষুদ্র মাপের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তাকে অতিক্রম করে কল-কারখানা ভিত্তিক বৃহদায়তন শিল্প-পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হল। স্থানীয় কোন জুতা-প্রস্তুতকারী মুচির সঙ্গে বাটা স্যু কম্পানীর তুলনা করলেই শিল্পবিপ্লব বলতে কি বোঝায় তা জানা যাবে। একাধিক দিন শ্রম দিয়ে একজন ব্যক্তি এক জোড়া উন্নতমানের জুতা প্রস্তুত করতে পারে। অপর দিকে বাটা কারখানায় বহুসংখ্যক উন্নতমানের জুতা-জোড়া প্রস্তুত হচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায়। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে এবং 'শ্রম-বিভাজন' ও 'কর্মের বিশেষীকরণ' পদ্ধতির মাধ্যমে বহু শ্রমজীবী মিলিতভাবে পণ্য উৎপাদনে যে পরিমানগত ও গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। শিল্পের বিপ্লব হ'ল মানুষের এই যৌথ প্রচেষ্টার সংগঠন ; কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন কর্ম পরিচালনা করে পণ্যের উৎকর্ষ এবং পণ্যের পরিমান বৃদ্ধিতে অভাবনীয় উন্নতিসাধন।

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দরুণ মানুষ সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবন করার, সামাজিক বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। প্রধান যে বিষয়টি সকলের নজর কেড়েছিল তা হ'ল শিল্প-উৎপাদনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অ্যান্থনী গিডেনস্ (Anthony Giddens) সঠিকই বলেছেন, শিল্পবিপ্লবের পরিচয় সামান্যই নিহিত রয়েছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মধ্যে ; তাঁর মতে শিল্পবিপ্লবের মূল পরিচয় পাওয়া যাবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কল-কারখানা এলাকায় অবিরাম অসংখ্য মানুষের অভিবাসন (migration) প্রক্রিয়ায়।

সহযোগিতার ভিত্তিতে, সমবেতভাবে, কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে কর্মস্থলের কাছাকছি বাসস্থানের প্রয়োজনীতা দেখা যায়। তাই কারখানা এলাকায় দ্রুত বসতি গড়ে উঠতে থাকে। শিল্পাঞ্চলগুলি ক্রমেই শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন-এর এক যুগপৎ প্রক্রিয়া নতুন সমাজজীবনধারা বিস্তার করে। এই নতুন সমাজ ও নতুন জীবনধারা সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন নতুন প্রশ্ন, নতুন সমস্যা ও নানাবিধ সরল ও জটিল আন্তঃমানবিক সম্পর্ক। শিল্পায়ন ও নগরায়নের সঙ্গে আধুনিককরণেরও প্রসার ঘটে। সামগ্রিকভাবে সমাজের কাঠামোতে, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া প্রকট হয়।

শিল্পের প্রসারের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা উল্লেখ করা হল তাতে গ্রাম থেকে শহরে এক নিরবচ্ছিন্ন অভিবাসন প্রক্রিয়া নির্দেশিত। গ্রামাঞ্চল ও শহরতলী থেকে কর্মপ্রাপ্তির আশায় মানুষ জড়ো হয়েছে শহরে, নগরে, শিল্পাঞ্চলগুলিতে। এর ফলে দু'দিকে দু'ধরনের প্রবণতা ও সমাজিক সম্পর্কগত সমস্যা তৈরী হয়েছে। গ্রামে ও শহরতলী থেকে মানুষের চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, শহরাঞ্চলে সেই চাপ বেড়েই চলেছে। ফলে উভয় দিকেই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। পুরানো পরিবার ব্যবস্থা, পুরানো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পুরানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পাল্টে গিয়ে নতুন জীবনধারার সূত্রপাত হয়েছে। আর এই সব পরিবর্তন প্রক্রিয়া অনধাবন করেই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, সমাজচিন্তা বিকশিত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের গুরুত্বের কথা মনে রেখেই আগস্ত কঁত্ আধুনিক সমাজকে শিল্পসমাজ (Industrial Society) এবং সদর্থক, বিজ্ঞানবাদী, (Positive Soceity) সমাজ নামে অভিহিত করেছেন। এই শিল্পসমাজে শিল্পের কর্ণধারগণই নেতৃত্ব দেবেন বলে তিনি মনে করেন। ভিন্ন চিন্তার, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ কার্ল মার্ক্সও বলেন, শিল্পবিপ্লব প্রাথমিকভাবে এক বিরাট সাজিক প্রগতির সূচনা করেছিল সামন্তসমাজে কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে (যদিও তাঁর মতে পরবর্তীকালে শিল্পের কর্ণধার বুর্জোয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী শ্রমজীবীদের নির্মমভাবে শোষণ করে সমাজব্যবস্থার অমানবিক দিকটাই প্রকট করে তুলেছিল)।

কঁত্ ও মার্ক্স এর অনেক আগে শিল্প বিপ্লবের জোয়ারে অর্থনীতি (Economics) নামে আর একটি নতুন শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith), জেমস্ মিল (James Mill), ডেভিড্ রিকার্ডো (David Ricardo) প্রমুখ সেই শাস্ত্রের আদি, ক্লাসিকাল (Classical), চিন্তানায়কগণ সম্পদ সৃষ্টি, বন্টন ও বিনিময় সংক্রান্তে যে সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করেছেন সেগুলিও নানাভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশে সহায়তা করেছে। সর্বোপরি ফরাসী দেশের ১৭৮৯ সালের বিপ্লবপ্রক্রিয়া যে নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ-এর প্রবাহ সমাজচিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্পাঞ্চলগুলিতে প্রায় শুরু থেকেই সামাজিক অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক সম্পর্কগুলো নতুন রূপ নিয়েছে। পুরানো মূল্যবোধের উপর আঘাত নেমেছে। কারখানার মালিক ও কারখানার শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাধান্য লাভ করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন ও মালিকগণ প্রথম থেকেই তাদের লভ্যাংশ বৃদ্ধির প্রয়াসে শ্রমিকদের প্রয়োজনের / দাবীর কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। তার ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক শুরু থেকেই বৈরীভাবমূলক। পরবর্তীকালে কার্ল মার্ক্স শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অমানবিক চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বুর্জোয়া মালিক গোষ্ঠী কিভাবে শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন / শোষণ চালিয়েছে তার বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আবির্ভাবকালে শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়াজাত এই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমস্যাই ছিল প্রধান রসদ।

নিউটন থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আবিষ্কার উদ্ভাবনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তারই পরিণতি হিসাবে ১৭৬০ সাল নাগাদ ঐ দেশেই শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংল্যান্ড এমনিতেই শিল্পকর্মে অনেক অগ্রসর ছিল। তদপুরি ইংল্যান্ড যেভাবে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তাতে তার পক্ষে শিল্পায়নের গতি বাড়ানো অনেক সহজ হয়েছিল। যেটা লক্ষণীয় বিষয় তা হল এই যে শিল্পে প্রযুক্তির বিস্তার এবং নতুন যন্ত্রপাতি ও শিল্পসংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ যারা করেছিলেন তারা নিজেরা কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। যাঁরা এই বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা প্রধানতঃ জিন নিজ পেশায় যুক্ত থাকার সুবাদেই, অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে, নানা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম

হয়েছিলেন। এঁদের বিজ্ঞানী না বলে প্রযুক্তিবিদ্ বলে অভিহিত করাই সঙ্গত। যাই হোক্ এঁরা এবং শিল্পোদ্যোগীরা মিলে ইংল্যান্ডের শিল্প-সংগঠনে যে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন তা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনকে বিপুলভাবে নাড়া দিল। শিল্পবিপ্লব একপ্রকার সমাজবিপ্লবের রূপ পরিগ্রহণ করল। চিন্তাশীল মানুষেরা সেই সমাজবিপ্লবের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বিশ্লেষণে উদ্যোগী হলেন। আমরা আগেই জেনেছি অ্যাডাম স্মিথ্ প্রমুখরা অর্থনৈতিক সংগঠনগত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থশাস্ত্র নামক প্রথম সমাজ বিজ্ঞানটির সূত্রপাত করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্ব নামক সমাজ বিজ্ঞানটির আবির্ভাব হতে আরও কিছু সময় লেগেছিল ; কিন্তু শিল্পবিপ্লব যে সমাজ পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত করেছিল তাকে বুঝতে গিয়ে, তার তাৎপর্য বিবেচনা করতে গিয়ে, নানা ধরনের লেখক ও চিন্তানায়াক সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তিগুলো তৈরী করে দিচ্ছিলেন

শিল্প বিপ্লবের প্রধান বিষয়টা কি ? ১৭৬০ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত শিল্পবিপ্লবের প্রথম অধ্যায়টির দিকে লক্ষ্য রাখলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। ১৭৬০ সালের আগে শিল্প উৎপাদনে এটাই রীতি ছিল যে গ্রামে বসবাসকারী শিল্পকর্মীদের কাছেই কাঁচা মাল পৌঁছে দেওয়া হবে এবং উৎপাদিত পণ্যটি সেখান থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৮২০ সালের পর চিত্রটি পাল্টে গেল ; যাবতীয় উৎপাদন কর্ম হবে ফ্যাক্টরী বা কারখানায়। কাঁচামাল যাবে কারখানায় ; আবার কারখানা থেকেই বিক্রয়যোগ্য পণ্য নিয়ে যেতে হবে বাজারে। ১৭৬০ থেকে ১৮২০ এই ষাট বছরে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই যে পরিবর্তন হ'ল তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল আজ আমরা অনেকেই অবগত আছি। সমাজ-কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্কের দিক্ থেকে এই পরিবর্তনের ফলাফল ছিল ব্যাপক। সাধারণভাবে বৃহত্তর সমাজে গ্রাম ও শহরতলীর প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকল ; গ্রাম-সমাজের, গ্রামীণ পরিবার ব্যবস্থার কাঠামোগুলো ভাঙতে আরম্ভ করল। শহরের, শিল্পাঞ্চলগুলির, কারখানা প্রধান এলাকার গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন সম্পদ ও সভ্যতার প্রসার ঘটল, তেমনি অপরদিকে নতুন সভ্যতার অন্ধকার দিক্গুলো (যেমন অপরাধপ্রবণতা, শোষণ- অত্যাচার,বৈষম্যজনিত সমস্যা ইত্যাদি) উত্তরোত্তর প্রট হয়ে পড়ল। শিল্পবিপ্লবোত্তর এই সব পরিবর্তনখীল সমাজ জীবনধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়েই বিকশিত হতে থাকল সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা। তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ক্ষেত্রসমীক্ষা (Sruvey work) ভিত্তিক সমাজতত্ত্বেরও বিস্তার ঘটল নানা দেশের গবেষণা-সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।

১.৩.২ ফরাসী দেশের বৌদ্ধিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

ফরাসী দেশের এন্লাইটেন্মেন্ট (Enllightenment) বা জ্ঞানদীপ্ত ধারা নামক বৌদ্ধিক আন্দোলনকেই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রথম স্তর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দেশের এই জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রবর্তকগণ আগেকার চিন্তানায়কদের তুলনায় অনেক রীতিমাফিক এবং সুসংবদ্ধভাবে মানুষের অবস্থান ও অবস্থার আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করেছিলেন। এঁরাই প্রথম সচেনতভাবে বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগ করে মানুষের সমাজ এবং মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত ধারাকে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রারম্ভিক পর্ব বলে নির্দেশ করার প্রধান কারণ হ'ল এই যে, ঐ সময় থেকেই সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে বিবেচিত ও বিশ্লেষিত হতে থাকে। মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। যুক্তি বিচারই মানুষকে প্রকৃত মুক্তির ও স্বাধীনতার পথ দেখাতে পারে। এই ধরনের প্রত্যয় প্রকাশ করে এবং সর্বদাই এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তথা 'যাচাই করে গ্রহণ করার' মানসিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এন্লাইটেন্মেন্ট এর মানুষেরা বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণকে সমাজ-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও আবশ্যিক করে তুলল। মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে এবং মানুষ নিজেকে আরও উন্নত, আরও পরিপূর্ণ করে তুলতে

পারে— এই ধরনের জ্ঞানদীপ্তপ্রত্যয় অল্পকাল পরে ফরাসী দেশের অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ের বিপ্লবীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী দেশের ঐ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উৎস যেমন সেই দেশের জ্ঞানদীপ্ত ধারা, তেমনি সেই বিপ্লবের অন্যতম প্রভাব পরিণতি হ'ল সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তনকে সনিষ্ঠভানে অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করার তাগিদ অনুভব করা।

জ্ঞানদীপ্ত ধারা খুব জোরালভাবে এই প্রত্যয়টি উপস্থাপিত করে যে মানুষই বিশ্বপ্রকৃতি অনুধাবনে, বিশ্বরহস্য উন্মোচনে, সক্ষম। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে বিশ্বপ্রকৃতিকে, প্রাকৃতিক সম্পদকে, ব্যবহার করতে পারে। মানুষের এই ক্ষমতার ভিত্তি হল তার যুক্তি-বুদ্ধি। Reason বা যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী হওয়াতে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত নিয়মগুলো আবিষ্কার করে সেই মত তার জীবনযাত্রা পরিচালনায় সক্ষম হয়েছে, তার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুন করে সংগঠিত করতে পেরেছে। আসলে পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ ইউরোপে যে আধুনিকতা ও নব্যবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তার উপর অগাধ আস্থা নিয়েই অষ্টাদশ শতকের এই জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রবর্তকগণ যুক্তি-বিচার এবং পর্যবেক্ষণ পরীক্ষাকেই সত্যানুসন্ধানের দুটি মূল স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ভৌত জগৎ কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজ জগৎ ও সাংস্কৃতিক জগতেও কিছু নিয়ম বিধি থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞান ও যুক্তি বিদ্যায় আস্থাশীল জ্ঞানদীপ্ত মানুষেরা তাই সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্তি-বিচার এর নিরিখে বিশ্লেষণ করে যা গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য নয় সেগুলি বর্জন করার প্রস্তাব হাজির করেছেন। এইভাবে এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট ইউরোপীয় সমাজে পরিবর্তন ও প্রগতির সন্ধান দিয়েছে। এঁদের প্রধান অস্ত্র ছিল সমালোচনা (Criticism)। সন্দেহ নিরসনের মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিলেন রেনে দেকার্ত সেটা জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই কোন কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারনার ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়ে কেবলমাত্র যুক্তি-বুদ্ধি আশ্রয় করে সমাজজীবন যাপন করার কথা তাঁরা বলেছেন। মানুষের স্বাধীন চিন্তার অধিকারের দাবীও তাঁরা জানিয়েছিএলন। তাঁদের মতে সামন্ত প্রভূতের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। তাঁরা আবার নৈতিকতার প্রশ্নে ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক। দেকার্ত-এর দর্শন তাঁদের আকৃষ্ট করলেও তাঁরা কিন্তু নিউটনীর কর্মপদ্ধতির প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অবরোহ পদ্ধতির তুলনায় নিউটনীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কদের অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল। তথা অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এক কথায় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান-এর ভিত্তিতেই তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক নীতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেছেন। বস্তুজগৎ সর্বজনীন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এরূপ বৈজ্ঞানিক অনুমান-এর ভিত্তিতেই নিউটন দেখিয়েছেন বিশ্বের ঘটনাবলী, পার্থিব জগৎ-এর উপাদানগুলি, কোন এলোমেলো অসংলগ্ন ব্যাপার নয়। কন্‌ডিলাক (Condillac), ডি এলেমবার্ট (D Alembert) প্রমুখ জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কগণ এই নিউটনীয় বিজ্ঞানের সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রগতির শর্তগুলি বিচার করেছেন। সমালোচনামূলক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সদর্থক বিজ্ঞানবাদকে যুক্ত করে জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কগণ যে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার প্রথম স্তর বলে অভিহিত হতে পারে। যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ (Reason and observation) উভয়ের মিলনেই কেবল সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এই নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক দর্শন যেমন এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট্-এর প্রত্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি এটাই অষ্টাদশ শতকের সমাজদর্শন তথা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনারও ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।

নিউটনের পাশাপাশি ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তানায়ক জন লক্-এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

লক্-এর অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন কন্ডিলাক (Condillac) আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে আরও প্রসারিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তথ্য ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধি মিলিয়ে পার্থিব জগৎ ও সমাজজগৎকে অনুধাবন করার এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নিউটন ও লক্ উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত। জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়কগণ সমাজতত্ত্ব নির্মাণে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন এই নতুন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা-পদ্ধতি হাজির করে। পশ্চিমী সমাজতত্ত্ব পরবর্তীকালে যে কেবল জ্ঞানদীপ্ত ধারাকেই আঁকড়ে ধরেছিল তা বলা যাবে না। তবে যাঁরা তাঁদের বর্জন করেছেন তারাও প্রাথমিকভাবে জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রস্তাবগুলোকে বিবেচনা করেই তাঁদের নতুন সমাজতত্ত্ব রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। Arving M. Zeitlin সঠিকই বলেছেন, ''Much of Western sociology developed as a reaction to Enlightenment.''

১.৪ বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লব

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেই সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব। প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগে সমাজ নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা হয়নি এমন নয়। আমরা প্লেটো বা এ্যারিস্টটল-এর লেখায় কিংবা প্রাচীন ভারতে কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে নানা সামাজিক প্রশ্নের উপস্থাপনা দেখব। তবে কিনা এঁরা কেউই স্বতন্ত্রভাবে কেবল সমাজচর্চায় নিজেদের যুক্ত রাখেন নি। তেমনি বলা যায় মধ্যযুগের পন্ডিত মানুষেরাও নানাভাবে সমাজচিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সমাজভাবনা ছিল ভীষণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও গোঁড়ামির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তথাপি অন্য আর একটি কারণে আধুনিক সমাজচিন্তা ও সমাজতত্ত্ব গঠনে মধ্যযুগের বিশিষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণটি হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন—বিশ্ববিদ্যালয়ের আগমন।

বিশিষ্ট লেখক Randall Colling বলেন, ''The major contribution of the Middle Ages to subsequent thought was not an idea, but an institution : the rise of the Univerisity.'' অর্থাৎ উত্তরকালীন চিন্তার জগতে মধ্যযুগের প্রধান অবদান খুঁজে পাওয়া যাবে কোন ভাব বা ধারণা সংগঠনের মধ্যে নয়। 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংগঠনের মধ্যেই সেই অবদান লক্ষ্য করা যাবে।

রেনেসাঁস-এর কিছু আগে একাদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শহরে (যেমন পারী, বলোনা, অক্সফোর্ড) ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠিত সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই সমাবেশগুলি ক্রমে ক্রমে চার্চ এবং রাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে স্বশাসিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসনের অধিকারী হওয়ার পর শিক্ষিত মানুষদের একাংশের কাছে উপার্জন ও জীবনধারণের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের সংখ্যা যেমন বাড়ল তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একপ্রকার প্রতিযোগীতাও দেখা দিল। তার ফলে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক এদের মধ্যে নতুন ভাবনা, নতুন বিজ্ঞান চিন্তা ও নতুন দার্শনিক ধারণার প্রকাশ ঘটতে থাকল। ইউরোপের মধ্যযুগে উদ্ভূত এই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল মানুষ তথা বুদ্ধিজীবীদের কাঙ্খিত ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি আধুনিক বৌদ্ধিক ধারাটি গড়ে ওঠে নি। কেননা, পঞ্চদশ শতক তথা রেনেসাঁস-এর শতকে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছে, ছাত্রসংখ্যাও কমে আসছে। সৃজনশীল লেখকও দার্শনিকগণ বিশ্ববিদ্যালয়-এর আশ্রয় ছেড়ে কোন রাজা বা ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন যাপন শুরু করেন।

চার্চ-এর সামগ্রিক নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-এর মধ্যেই মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিকশিত হচ্ছিল। রেনেসাঁস-এর সূত্রপাতে দেখা গেল চার্চ এবং তার অধীনস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরেও বুদ্ধিজীবীরা তাদের জীবিকার সংস্থান করতে পারে। এবং এর ফলে চিন্তাশীল মানুষেরা সেক্যুলর (বা ধর্মনিরপেক্ষ) মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন-এর প্রসারে অগ্রসর হতে পারলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞান মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের নানাবিধ সৃজনশীল কাজ চলতে লাগল। এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার আগমন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথ্য আহরণভিত্তিক, সংশ্লেষাত্মক গবেষণা কর্মের সঙ্গে তাত্ত্বিক সাধারণীকরণ-এর (Generalization) প্রবণতাকে যুক্ত করা হয়। আধুনিক দর্শনেরও সূত্রপাত হয় এই সময়ে— বেকন, দেকার্ত, লাইবনিৎস প্রমুখ চিন্তানায়কদের অবদানের মধ্য দিয়ে। সমাজবিজ্ঞান এর পক্ষে অবশ্য বিকাশ-প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজ ছিল না। ধর্মসংস্কার আন্দোলন, প্রোটেস্টান্ট মতবাদ, পিউরিটান বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনা ইউরোপীয় সমাজের আদর্শগত ভিত্তি নির্ণয়ে জটিলতা এনে দিল। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি বিজ্ঞান যদিও বা ভাবাদর্শ-নিরপেক্ষ হতে পারে সমাজবিজ্ঞান কোনমতেই অনুরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না। যে কারণে দেখা যায় ঐ সময়ে যে সমাজবিদ্যাটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেই ইতিহাসশাস্ত্র কোন ক্ষেত্রে ক্যাথলিকদের পক্ষে আবার কোন পণ্ডিতের লেখনীতে প্রোটেষ্টান্টদের পক্ষে ওকালতি করেছে।

চার্চ ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বন্দ্ব এই সময়কার বৌদ্ধিক প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমশই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের অধীনেই বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত হয়েছে। Randall Collins লিখেছেন, ''social science when it appeared in germany was part of the official interest in developing information and technique for Government purposes.'' অর্থাৎ জার্মানীতে যখন সমাজবিজ্ঞান এল তখন তা মূলতঃ সরকারী প্রয়োজনে, তথ্য ও কৌশল ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই কাজে লাগান হয়েছিল। এজন্য প্রথম দিকে এই সমাজবিদ্যাকে জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান (State Science বা staats wissenschaft) বলা হত।

ঐ সমাজবিজ্ঞান ছিল জনপ্রশাসন এবং বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানের এক বিচিত্র মিশ্রণ। তবুও একেই আমরা ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ব চর্চার উৎস বলে নির্দেশ করতে পারি। ফ্রান্সে সৃষ্টি হ'ল এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক অভিজাতগোষ্ঠী। এই নতুন অভিজাতগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত সেক্যুলর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিল এই গোষ্ঠী থেকেই এসেছিলেন মন্তেস্কু (Montesquicu), তুর্গো (Turgot) কন্দরসে (Condorcat) বা পরবর্তী সময়ে তকেভিল (Tocqueville)-এর মত চিন্তানায়কগণ।

ইংল্যান্ডের অবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্ন। সেখানে প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রোমান চার্চ-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে যেমন মুক্ত হল, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতদের যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবনা চিন্তার সুযোগ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে উঠল। তবে নানা কারণে সেখানে ফ্রান্স বা জার্মানীতে যেমন হয়েছিল, দীর্ঘদিন সেরূপ কোন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তক গোষ্ঠী (School of thought) গড়ে ওঠেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করতে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে অষ্টাদশ শতকের জার্মানীতেই আসতে হবে। ফ্রান্সে যখন জ্ঞানদীপ্ত ধারা (Enlightenment) প্রধান হয়ে উঠেছে তখন জার্মানীতে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নীরব বিপ্লব ঘটছিল। প্রুশিয়া ও তার চারপাশে (তখনও সমগ্র অঞ্চল জার্মানী নামে স্বীকৃতি

পায়নি) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই যে উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সকলের আনুগত্য নিশ্চিত করা। উচ্চশিক্ষা লাভ করে অনেকে শিক্ষকতার পেশায় যেমন নিযুক্ত হতে পেরেছে তেমনি কোন কোন স্নাতক চার্চের লোভনীয় পদেও নিযুক্ত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে ক্রম বর্দ্ধমান মানুষ যেমন উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে তেমনি তার চাপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলাবিভাগের প্রসার ঘটেছে, নতুন নতুন প্রফেসর-এর পদ তৈরী হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষক মহলে আলোচনা উঠেছে। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে চর্চা হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের কাজ পরবর্তীকালে ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার উন্নতির প্রভূত সাহায্য করেছে। এই সময়েই জার্মানীতে ঘটেছে সেই বৌদ্ধিক বিপ্লব যার কর্ণধার ছিলেন কান্ট (Kant), ফিখ্‌টে (Fichte), শেলিঙ্ (Schelling), হেগেল (Hegel), শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। এই সব উচ্চমানের দার্শনিকদের অবদান এবং সাধারণভাবে জার্মানীর প্রায় দুই ডজনের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যস্ত কার্যকলাপ জার্মানীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর জগতে নেতৃস্থানীয় করে তুলল। তাই R. Collins লিখেছেন, ''The German University revolution was to be imitated eventually around the world.'' উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমাজতত্ত্বের অন্যতম রূপকার এমিল দুরখাইম (Emile Durkhaim) তাঁর প্রথম জীবনে জার্মানীতে গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছেই প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই গড়ে তোলা হচ্ছে। ইংল্যান্ডে জার্মান বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রভাত ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরেজি ভাববাদী দার্শনিকগণ ছাড়াও বারট্রান্ত রাসেল-এর মত মানুষকেও দেখা যাচ্ছে দর্শনের জগতে সর্বাধুনিক প্রবণতাগুলো জানবার জন্য জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা করছেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লব আমেরিকাতেও প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৬ সালে জন হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হল একেবারেই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল অনুসরণে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাত-প্রতিঘাত এর মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানমূলক নতুন নতুন ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটেছে। সংগঠিত ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সুসংবদ্ধ জ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করতে পারে এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেভাবে এই শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছিলেন তা এখন ইতিহাস। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। কিন্তু রাজনীতি চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজকাঠামো / সমাজপ্রবাহ অনুশীলন যেমন ফ্রান্সের জ্ঞানদীপ্ত ধারার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে তেমনি অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা যে বৌদ্ধিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিল তার অন্যতম ফল হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা-বিশ্লেষণ-এর উল্লেখ করা যাবে।

১.৫ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের কতিপয় বিশিষ্ট সমাজ চিন্তানায়ক / সমাজ দার্শনিক

সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক সংহতি, সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে এই সমস্যাগুলি যে নতুন মাত্রা ও চরিত্র পরিগ্রহণ করেছিল তার সঠিক অনুধাবনা ও বিশ্লেষণ ছিল প্রথম যুগের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্র। পৌর সমাজকে রাষ্ট্রীয় সমাজ থেকে (Civil Soceity and Political Society) স্বতন্ত্র করে নিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন এই প্রথম যুগের চিন্তানায়কগণ। ইতালীর ভিকো (Vico) ও ফ্রান্সের মন্তেস্ক্যু (Montesquieu) এবং স্কটল্যান্ডের ফারগুসন্ (Ferguson) ও মিলার (Millar) সমাজতত্ত্বের এই প্রস্তুতি পর্বের লেখক। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় এককে মন্তেস্কু

সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে অন্য তিনজন লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে **গিয়ামবাতিস্তা ভিকো** (১৬৬৮-১৭৭৪) দি নিউ সায়েন্স (The New Science) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সমাজচিন্তামূলক এই গ্রন্থে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে বলা হয়েছে ধর্ম, সম্পত্তি, ভাষা ও শিল্প-সাহিত্যের উত্থানের কথা। ১৭৪৮ সালে মন্তেস্ক্যুর "The Spirit of the Laws" প্রকাশ পাওয়ার অল্পকাল আগে ১৭৪৪ সালে ভিকোর গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ্যালান সুইন্‌জউড্-এর মতে (Alan Swingewood) ভিকো ও মন্তেস্ক্যুর এই দুটি গ্রন্থই সর্বপ্রথম সমাজকে সংগঠিত ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপিত করেছে এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে সমাজের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর সম্পর্ক নির্দেশ করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাস সকলের বোধগম্য করার প্রয়াসে ইতিহাসের ত্রিবিধ স্তর বা তিনটি স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের কথা বলেন—প্রথমতঃ দৈব পর্যায় (age of the Gods), দ্বিতীয়তঃ বীরপুরুষদের পর্য্যায় (age of the Heroes) এবং সর্বশেষে মানুষের পর্যায় (age of Men)। নবতম পর্যায়ে ভিকো মানুষের সৃজনশীল সক্রিয়, ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। পৌরসমাজ মানুষেরই সৃষ্টি— সমাজের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর রয়েছে—সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং মানবিক সম্পর্কগুলো মানুষেরই সচেতন ক্রিয়াকলাপের ফল এই সব আধুনিক প্রত্যয়গুলো ভিকো জোরালভাবে হাজির করেন। হবস্, লক্ প্রমুখ **চুক্তিবাদীদের অনৈতাসিক** দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করে ভিকো পরিবর্তনশীল মানবপ্রকৃতির কথা বলেন এবং মানুষের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন। সমাজবিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে তিনি এক অসাধারণ নীতি নির্দেশ করেন—তিনি বলেন, মানুষ কেবল সেই সব বিষয়ই জানতে পারে যা মানুষেরই তথা সমাজেরই সৃষ্টি। ভিকোর মানবতাবাদী ইতিহাস দর্শনকে হেগেল ও মার্ক্স-এর ইতিহাস দর্শনের পূর্বসূচক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অনুবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (atomic individualism) বর্জন করে তিনি যে সামগ্রিক গঠনগত নীতির (organic whole) ভিত্তিতে সমাজকে অনুধাবন করার কথা বলেছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্বের কর্ণধারদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্কট্‌ল্যান্ডে এক নতুন জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রকাশ ঘটে। দার্শনিক ডেভিড্ হিউম, (David Hume) এই ধারার অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনায় সমাজতত্ত্ব পাওয়া যাবে না ঠিকই ; কিন্তু স্কট্‌ল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ্ এ্যাডাম স্মিথ বা স্কট্‌ল্যান্ডের দার্শনিক ফারগুসন্-এর উপর তাঁর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। আবার ফারগুসন ছাড়াও জন্ মিলার (John Millar) নামে অপর এক ব্যক্তিত্ব সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

হিউম ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক (Empiricist)। অভিজ্ঞতা, ঘটনা, তথ্যাবলী, উপযোগিতা এ সবই ছিল তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজ দর্শনের ভিত্তি। মানবচরিত্র গঠনে বাস্তব অবস্থা, পরিবেশ তথা সামাজিক উপাদানের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে তিনি মনে করতেন। এই হিসাবে বলা যায় দার্শনিক হলেও তাঁর মধ্যে সমাজতত্ত্ব ছিল।

এটা ঠিকই যে অষ্টাদশ শতক শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে সমাজতত্ত্বকে পৃথক করে নেওয়ার অবস্থা তৈরী হয় নি। যেমন, এ্যাডাম স্মিথ্-এর মধ্যে অর্থনীতি, দর্শন ও সমাজচিন্তার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে স্কটল্যান্ডের বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন সমাজ হ'ল ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের বিষয়। সব কিছুর ঊর্দ্ধে তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এবং এক ধরনের সমাজ থেকে আর এক ধরনের সমাজে উত্তরণ-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। মিলার (Millar) যেমন মনে করতেন মানব সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে অমার্জিত, অনুন্নত স্তর থেকে উন্নত, পরিশীলিত স্তরে। **ফারগুসন** (Ferguson)

উল্লেখ করেছেন অসভ্য, বর্বর ও উন্নত সমাজের ক্রমোচ্চ স্তরের কথা। ফারগুসন ও মিলার উভয়েই সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। স্তরবিন্যাসের সঙ্গে শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমাজের সংস্কৃতিগত প্রগতির উৎস হ'ল শিল্পায়নগত পরিবর্তন। স্কট বুদ্ধিজীবীরা সমাজ পরিবর্তন, প্রক্রিয়াগত দ্বন্দ্ব এবং স্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের বিকাশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানুষের ক্ষমতা এবং তৎপরতার প্রতি ফারগুসন বিশেষ আস্থা রাখতেন। তিনি লিখেছেন, "...the most animating occasions of human life, are calls to danger and hardship, not invitations to safety and ease." অর্থাৎ তাঁর মতে মানুষের মূল পরিচয় নিহিত থাকে আমার-আলস্যের জীবনে নয়, বরং বিপদ সামলানো এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে। মন্তেস্ক্যুর অব্যবহিত পরের ফরাসী জ্ঞানদীপ্ত ধারায় যে অনুবাদী (atomic) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে সমাজতাত্ত্বিক ধারাটি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে ফারগুসন পৌর সমাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে সাহায্য করেন। বলা যেতে পারে ভিকোর মতই ফারগুসন ও মিলার মানবসমাজ বিজ্ঞানের ভিতি রচনা করেছিলেন এবং ঐ বিজ্ঞানের মূল প্রশ্ন ও সমস্যাবলীর ইঙ্গিত দানে সক্ষম হয়েছিলেন।

১.৬ সারাংশ

সমাজ তথা সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস-প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে চর্চা করা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ঘটনা। সাধারণভাবে শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিক পর্যায়টিকেই সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পৌর সমাজের ধারণা গড়ে ওঠা এবং রাষ্ট্রীয় সমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব।

১৮৩০-এর দশকে সমাজতত্ত্ব নামটি চয়ন করেছিলেন আগস্ত কঁত্। কিন্তু ঐ আনুষ্ঠানিক নামকরণের বহু আগেই শাস্ত্রটির জন্ম হয়েছিল শিল্পবিপ্লব ও অন্যান্য সমাজ বিপ্লবের পরিণতি স্বরূপ। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি ফ্রান্স ও জার্মানীতে নানাধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার প্রসারে সাহায্য করেছে।

শিল্পোৎপাদনে পদ্ধতিগত পরিবর্তন অর্থাৎ 'কারখানা ব্যবস্থার' প্রবর্তন মানুষের অতীত ও বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে যেমন সমুদ্রসম ব্যবধান এনেছে, তেমনি তার সমাজজীবনেও এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শহর ও শিল্পাঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় মানুষ জড় হয়েছে। ফলে গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই পরিবার কাঠামো ও সমাজ-কাঠামোতে নতুনত্ত্ব, পরিবর্তন, দেখা গেছে। আর এই সব পরিবর্তন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। কঁত আধুনিক সমাজকে শিল্প-সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। কার্ল মার্ক্স শিল্পবিপ্লবের পরিণতিস্বরূপ সামন্তব্যবস্থার ভাঙনকে যেমন প্রগতির নির্দেশক বলেছেন, তেমনি আবার নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী যেভাবে ধীরে ধীরে শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য শ্রমজীবীদের উৎসাহিত করেছেন, সমাজজীবনধারার এই নতুন বিচার ভিন্ন ধরনের সমাজতত্ত্ব (মার্ক্সীয়-সমাজতত্ত্ব) গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তবে সাধারণভাবেও বলা যায়—শিল্পায়নজাত শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব সংঘাতই ছিল সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রধান রসদ।

ফরাসী দেশের এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট (Enlightenment) বা জ্ঞানদীপ্ত ধারা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার অন্যতম

ভিত্তি রচনা করেছিল। এই ধারার প্রভাবেই সামাজিক কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে বিবেচিত ও বিশ্লেষিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবীরা অনেকেই এই জ্ঞানদীপ্ত ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই ধারা ইউরোপীয় সমাজে প্রগতি ও পরিবর্তনের সন্ধান দিয়েছিল। দেকার্ত-এর দর্শন ও নিউটনের বিজ্ঞান এই জ্ঞানদীপ্ত ধারার দুটি স্তম্ভ। পরবর্তীকালের লক্-এর অভিজ্ঞতাবাদ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আর একটি প্রধান ধাপ হিসাবে কাজ করেছে। জার্মানীতে বিশেষভাবে সংগঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়) সমাজতত্ত্ব গঠনে সহায়তা করেছে। সেক্যুলর শিক্ষাব্যবস্থা সমাজতত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করেছে।

ইতালীর ভিকো, ফ্রান্সের মন্তেস্ক্যু, ইংল্যান্ড তথা স্কটল্যান্ডের একগুচ্ছ বুদ্ধিজীবী (যেমন **স্মিথ্ ফার্গুসন**) এঁদের মিলিত অবদান সমাজতত্ত্বের বিকাশে সহায়তা করেছে।

১.৭ অনুশীলনী

(ক) **নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন**

(১) শিল্পবিপ্লব বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে লিখুন।

(২) শিল্পবিপ্লব কিভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা গঠনে সহায়তা করেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) জ্ঞানদীপ্ত ধারা (Enlightenment) কি হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা চিন্তার প্রাথমিক পর্ব বলে চিহ্নিত হবে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) **নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন**

(১) বিশ্ববিদ্যালয় বিপ্লব বলতে কি বোঝায় ? কিভাবে এই বিপ্লব সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আবির্ভাবে সহায়তা করেছে তার বিশদ আলোচনা করুন।

(২) সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার বিকাশে ভিকো, ফারগুসন ও মিলারের অবদান আলোচনা করুন।

(৩) সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার বিকাশে ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যান্ড-স্কট্ল্যান্ডের বিশিষ্ট অবদানের কথা বিবৃত করুন।

(গ) **শূন্যস্থান পূরণ করুন**

(১) সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তনের —— দেশকেই অগ্রগণ্য বলা যায়।

(২) সমাজতত্ত্বের নামটি চয়ন করেন বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ——।

(৩) —— ব্যবস্থার প্রবর্তনই হ'ল শিল্পকর্মে বিপ্লব।

(৪) —— সাল নাগাদ শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

(৫) সমাজতত্ত্বের অন্যতম রূপকার —— তাঁর প্রথম জীবনে জার্মানীতে ... পাঠ নিয়েছিলেন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Anthony Giddens — *Sociology — A Critical Introduction.*

(২) Randall Colling — *Three Sociological Tradition.*

(৩) Aaln Swingewood — *A Short History of Sociological Thought.*

(৪) Irving Zeitlin — *Ideology and the Development of Sociological Theory.*

একক ২ ❐ সমাজতত্ত্বের রাজনৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি (মন্তেস্ক্যুর অবদান)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ দর্শন, রাষ্টবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব
২.৩.১ মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস দর্শন
২.৩.২ মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তা
২.৪ **The Spirit of the Laws :** রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব
২.৫ বৈচিত্র-বিশৃঙ্খলা থেকে সংহতি : মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের মূলকথা
২.৬ সারাংশ
২.৭ অনুশীলনী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে রাজনীতি-বিজ্ঞান ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অনুধাবন করা যাবে।
- যাঁকে প্রথম সমাজতাত্ত্বিক বলা সম্ভব সেই ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী মন্তেস্ক্যুর কিছু তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি করা যাবে।
- জানা যাবে মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের মূল বক্তব্য কি।
- এটাও জানা যাবে যে সাম্প্রতিককালে যে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (Political Sociology) অনুশীলন হয় তার উৎস নিহিত রয়েছে মন্তেস্ক্যুর রচনায়।

২.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপেই সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। ইতালী, ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ডের জ্ঞানদীপ্ত ধারার সঙ্গে যুক্ত কিছু অগ্রণী মানুষ এই "প্রারম্ভিক" ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন ফ্রান্সের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী মন্তেস্ক্যু (Montesquieu)। ফারগুসন, মিলার প্রমুখ স্কটল্যান্ডের লেখকগণ মন্তেস্ক্যুর চিন্তার দ্বারাই প্রভাবিত হন। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত ধারার প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেই মন্তেস্ক্যু চিহ্নিত। ''The Spirit of the Laws'' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে মন্তেস্ক্যু জানিয়েছেন যে তিনি কোন সংস্কারবশতঃ নয়, বরং বিষয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তাঁর নীতিগুলো নির্দ্ধারণ করেছিলেন (I have not drawn my principles from my prejudices but

from the nature of things)। সমাজকে তিনি একটি কাঠামোগত সমগ্র (Structural whole) হিসাবে গণ্য করেছেন। তাই দেখা যায় তাঁর মূল যে 'শ্রেণী বিভাজনের তত্ত্ব' সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ বা ধরনগুলি সমাজব্যবস্থার চরিত্রের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মিলিয়েই উপস্থাপিত করা হয়েছে। মন্তেস্ক্যু মনে করতেন সমগ্র সমাজব্যবস্থার চরিত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট আদর্শগত সাংবিধানিক দাবীর একটা ভারসাম্য গড়ে তুলতে হয় এবং তার জন্য আইন প্রণেতাদের সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

মন্তেস্ক্যু মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর আস্থা রাখতেন। সমাজ-প্রবাহ এবং সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোকে তিনি নির্দিষ্ট বস্তুগত অবস্থার ফল বলে মনে করতেন। তাঁর এরূপ প্রত্যয় ছিল যে, ঐ বস্তুগত শর্ত বা অবস্থাগুলো অভিজ্ঞতাবাদী ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যাবে। অথচ এটাও লক্ষণীয় বিষয় যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর এতটা আস্থা থাকলেও মন্তেস্ক্যু সমাজের পরিবর্তন (Social Change) সংক্রান্ত কোন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা হাজির করেন নি। এখানে যে পাঠ হাজির করা হল তাতে এই সব বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে জানান হবে।

২.৩ দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের কত গভীর সম্পর্ক তা মন্তেস্ক্যুর রচনাবলী থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। মানুষের মূল প্রকৃতি ও চরিত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় বলে তিনি মনে করতেন না। বরং মনুষ্য প্রকৃতির, মানুষের ভাবাবেগ ও অনুভূতির, ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। এই মনুষ্যপ্রকৃতি-দর্শন তাঁর মনুষ্য সমাজ-দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এতে পরিবর্তনশীলতার নীতি অগ্রাহ্য হয়েছে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গতি বিনষ্ট হয় নি।

মন্তেস্ক্যুর দর্শন অনুযায়ী অতীত বর্তমানকে শিক্ষা দিতে পারে ; কেননা, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অতীতে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে। মানুষের সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো চরিত্রগতভাবে একই রকম রয়েছে—সুদূর অতীত থেকে সেগুলি একইভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই সব দার্শনিক অবস্থান যাঁরা চিন্তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে তাঁর সমাজতত্ত্বে কেন সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব অনুপস্থিত সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সামাজিক পরিবর্তনের দর্শন অনুপস্থিত হলেও মানব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তেস্ক্যু যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। যেমন তিনি বলেছেন, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা জীবনের মূল লক্ষ্য হতে পারে না ; বরং সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনই হ'ল শ্রেষ্ঠ জীবন (the best life is the virtuous one)। সদ্‌গুণ যেখানে প্রাধান্য পায় না সেখানে স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়। এটাও লক্ষণীয় যে তাঁর প্রথম রচনা Persian Letters (১৭২১) এবং শেষ রচনা "The Spirit of the Laws" (১৭৮৪) উভয়েরই প্রধান বিষয় হল 'সদ্‌গুণ (Virtue) ও স্বাধীনতা' (Liberty)।

'Considerations on the grandeur and decadence of the Romans' নামে তিনি আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লেখেন। ১৭৩০-এর দশকের গোড়ায় ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। ১৭২৮ থেকে ১৭৩১ সাল পর্যন্ত ৩/৪ বছর তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান যার বেশীর ভাগ তিনি ইংল্যান্ডেই কাটিয়েছিলেন। ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনধারা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বলা হয়ে থাকে, রোম সংক্রান্ত তাঁর

গ্রন্থটি আসলে পরোক্ষভাবে তাঁর নিজের দেশ ফ্রান্সের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লেখা। তিনি ফ্রান্সকে সংস্কারের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর উত্থান-পতনের প্রক্রিয়া তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তাঁর দর্শন অনুযায়ী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পতন এড়াতে বা পতন-প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার প্রয়াসে প্রথমেই পতনের কারণ জানা প্রয়োজন। রোমানদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে তিনি এই জন্যই "কারণ" (causes) অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। এবং এখানেই তিনি মানবপ্রকৃতির অচঞ্চল ধারার ও মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সমরূপতার দর্শন হাজির করেন।

২.৩.১ মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস দর্শন

সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে দর্শন চিন্তায় কার্য-কারণ (causality) সম্পর্কের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল মন্তেস্ক্যু তার সমর্থক ছিলেন। উপরন্তু মন্তেস্ক্যু সেই কার্য্য-কারণ সম্পর্ককে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাঁর বিশিষ্ট ইতিহাস দর্শন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিধি রচনায় তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন মূলত এই আশা নিয়ে যে অনুরূপ বিধি উপস্থাপন করা গেলে ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্রে কিছু সংস্কার করা যেতে পারে।

আমরা আগে জেনেছি মন্তেস্ক্যু 'সদ্‌গুণ' ও 'স্বাধীনতা'র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রোমের ইতিহাস পাঠে তিনি রোমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর 'সদগুণ'-এর (virtue) প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিল রোমের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রোমানদের মধ্যে জমির সমবন্টন নীতি প্রচলিত ছিল।এক সময়ে ঐ নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল ; রোমে বৈষম্য, অনৈক্য প্রকট হয়ে পড়ল। কিছু মানুষের লোভ, কিছু গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং মুষ্টিমেয়দের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন এই সব মিলে রোমের সংস্কৃতিতে সদ্‌গুণের অভাব দেখা দিল।

ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে প্রতিফলিত হয় নানাভাবে। মন্তেস্ক্যু অবশ্য এই ব্যবধানকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিরূপে গণ্য করেন নি। তাই তিনি বলেন, রোমের অধঃপতন হয়েছিল প্রধানতঃ তার আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, কোন শ্রেণী সংগ্রামের জন্য নয়। তিনি বরং অভিজাত গোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতাকে সমাজের সুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে মনে করেছেন।

জঙ্গী মনোভাব, প্রতিযোগিতার মানসিকতা কিংবা সামাজিক-আর্থিক ব্যবধান এই সব বিষয় কোন সমাজের (যেমন প্রাচীন রোমের) পতন ডেকে আনে না। কিন্তু যখন জঙ্গী, আক্রমণাত্মক ক্রিয়ার আড়ালে দুর্নীতি, অসাধুতা প্রসারিত হয় তখনই পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরূপই হয়েছিল প্রাচীন রোমের ক্ষেত্রে। উত্থান-পতনের এই ইতিহাস-দর্শন মন্তেস্ক্যুর সমাজচিন্তা, সমাজতত্ত্বকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

রাষ্ট্র ও সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী ভিকো (Vico) বা আরও কিছুকাল আগের হবস্ কিংবা ম্যাকিয়াভেলীর তুলনায় মন্তেস্ক্যু কতটা নতুনত্ব ও স্বকীয়তার দাবী রাখতে পারেন তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু তিনি যে ইতিহাস দর্শন ভিত্তিক সমাজ ও রাজনীতির আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়েছিলেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিচার বিশ্লেষণে যে ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ এনেছিলেন তার তাৎপর্য নিয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

যে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস চিন্তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তা হ'ল এইরূপ

প্রত্যেক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উত্থান-পতন এর একটি প্রক্রিয়া থাকে ;

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মূল্যায়ন করতে হয় নির্দিষ্ট 'পর্য্যবেক্ষণ-কাল' এর ভিত্তিতে। অবশ্য মন্তেস্ক্যুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হ'ল তিনি নিজে এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি সর্বত্র মানেন নি। তাঁর 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থে তাত্ত্বিক বর্গগুলো (Categories) কাল-নিরপেক্ষ আদর্শ-বর্গ হিসাবেই তুলনামূলক বিচারে এসেছে। তবে নিজে পদ্ধতি থেকে এই বিচ্যুতি যেমন তাঁর ইতিহাস-দর্শনকে দুর্বল করেছে, তেমনি এই দুর্বলতার মধ্য দিয়েই (তাঁর অজান্তে) সমাজতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরী হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

এমিল ডুর্খাইম বলেছেন, মন্তেস্ক্যুর রচনা পাঠ করলে সমাজতত্ত্বের বিষয়গুলো কী হতে পারে তা জানা যাবে। এমনকি কিরূপ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করলে ঐ সব বিষয় ঠিকমত আলোচিত বিশ্লেষিত হতে পারে সেইসব রাস্তাও মন্তেস্ক্যুর রচনাতে নির্দেশ করা আছে বলে ডুর্খাইম মনে করতেন। ডুর্খাইম যাকে সামাজিক বস্তুসত্য (Social facts) বলেছেন মন্তেস্ক্যুর রচনায় সেই বাস্তব ঘটনা / অবস্থান / প্রবণতাগুলোই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে ঘোষিত। অন্য যে কোন সত্যের মত সামাজিক বস্তুসত্যও কিছু সাধারণ নিয়মের অধীন। দেখা যাবে বস্তুসত্যের অংশগুলো একে অপরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত এবং সকলে মিলে তারা তৈরী করেছে এক সামগ্রিক বস্তুসত্য। সেটা একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন, সরকার) এর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যাবে তেমনি কোন ভৌগলিক পরিবেশ (যেমন ঘনবসতি অঞ্চল) বা ঐতিহাসিক পর্বের (যেমন, গুপ্তযুগের সংস্কৃতি) ক্ষেত্রেও আবিষ্কার করা যাবে।

বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মন্তেস্ক্যু জানিয়েছেন, তুলনামূলক আলোচনা এবং শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতির সাহায্যেই সঠিকভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চা হতে পারে। শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি প্রসঙ্গে Ideal types বা 'নিদর্শ প্রকরণ' এর কথা উল্লেখ করতে হয়। মন্তেস্ক্যুকৃত typology বা প্রকরণ বিন্যাস পরবর্তীকালে মার্ক্স হ্বেবরকৃত 'নিদর্শ প্রকরণ' (Ideal types)-এর বিন্যাসকে প্রভাতি করেছে বলা যায়। ইতিহাসের দর্শন থেকে বিচার করলে হয়ত এই ধরনের 'নিদর্শ-প্রকরণ'-এর ধারণাকে (তাত্ত্বিকের খেয়াল খুশীমত শ্রেণী বিভাজনের প্রচেষ্টাকে) অনুন্নত চিন্তার ফসল মনে হবে। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ এক অনবদ্য এবং অত্যন্ত উপযোগী পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি। তাই অনেকেই মনে করেন মন্তেস্ক্যুর অবদান যতটা না ইতিহাস-দর্শন-এর ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে, তুলনায় তা অনেক বেশী প্রাধান্য পাবে সমাজতত্ত্বে / সমাজবিজ্ঞানে।

২.৩.২ মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তা

'পারস্যের চিঠিপত্র' (Persian Letters) শীর্ষক রচনায় মন্তেস্ক্যু তাঁর সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমালোচনা করেছেন। যেভাবে সংস্থাগুলি পরিচালিত হচ্ছিল তাকে বর্জন করে তিনি 'স্বাধীনতা ও সদ্‌গুণ' প্রসারের জন্য আবেদন রাখেন। 'The Spirit of Laws' গ্রন্থে তিনি পুরানো রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করে মানুষের স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলেন।

মন্তেস্ক্যুর মতে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সদ্‌গুণ একসঙ্গেই যুক্ত থাকে। সমাজ ও ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ (virtue) ভ্রষ্ট হয় তবে দেখা যাবে স্বাধীনতাও অন্তর্হিত হয়েছে। আইনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি (spirit) আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাদের পরিচালিকা নীতির কথা বলেন। সদ্‌গুণ, সম্মান ও ভীতি এই তিন প্রকার

নীতি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নীতিগুলির দূষণ প্রকট হলে ব্যবস্থাগুলির অধঃপতনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা মন্তেস্ক্যুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইংরেজরা যেরূপ ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করে চলেছে মন্তেস্ক্যুর মতে সেটা সকলের কাছে উদাহরণস্বরূপ। মন্তেস্ক্যু স্বাধীনতার নিম্নরূপ সংজ্ঞা হাজির করেন ঃ "the right to do that which the laws permit, and if a citizen can do that which they forbid, he would no longer have it, because the others also have this power." অর্থাৎ স্বাধীনতা হ'ল, আইন যে সব কাজ অনুমোদন করছে সেই সব কাজে ব্যক্তির অধিকার থাকা। যদি কোন নাগরিক আইন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এমন কিছু কাজে অগ্রসর হয়, তবে সে অচিরেই জানবে যে তা সম্ভব নয় ; কেননা অন্যরাও তার মতই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে (আইন-লঙ্ঘন এর ক্ষমতা তার একচেটিয়া এটা মনে করা ভুল)। ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রাখা স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রধান শর্ত।

মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তার আকর্ষণীয় বিষয়টি হ'ল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব (theory of separation of powers)। তিনি মনে করেছেন স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করতে হ'লে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারের ধারণাকে নির্মূল করতে হবে। ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন। নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা একটি সংস্থা-সংগঠনের হাতে যাবতীয় শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে স্বাধীনতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তবে মন্তেস্ক্যু যখন বলেন অভিজাততন্ত্র বা নরমপন্থী (aristocratic or moderate) সরকারই স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারে তখন এটা মনে রাখতে হবে যে, তিনি নিজেই অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি যখন লিখছেন তখনও ইউরোপে আধুনিক সমাজ বিপ্লবগুলো সংঘটিত হয় নি।

মন্তেস্ক্যুর তত্ত্ব হ'ল 'Power stops power', কোন গোষ্ঠীর তরফে একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যবহারের প্রবণতা রুখতে হ'লে তার বিপরীতে আর এক গোষ্ঠীর ক্ষমতা সংগঠিত করতে হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় সমাজে তিনটি স্বতন্ত্র (এবং অপরিবর্তনীয়) স্তরের কথা উল্লেখ করেন। এই স্তরগুলি হ'ল রাজা (রাজপরিবার), মধ্যস্বত্বভোগী অভিজাতগণ এবং জনগণ। উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজাতগণ সরকারের একটি বিশেষ সংস্থা (যেমন ইংল্যান্ডে লর্ডসভা) দখলে রাখেন। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ দখলে রাখতে পারে। অতএব জনপ্রতিনিধিরা একদিকে এবং অভিজাতরা আর একদিকে—এই ভাবে দুই বিপরীত শক্তি একে অপরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। পরিণতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা এইভাবেই প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পেরেছে বলে মন্তেস্ক্যুর মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মেছিল। এই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব যদি দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব বলে গণ্য করা হয় তাহলেও তা গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মন্তেস্ক্যু মনে করতেন না। অভিজাত শ্রেণী ও জনগণের দ্বন্দ্বকে তিনি ভারসাম্য সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া বলেই গণ্য করেছেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে মন্তেস্ক্যু ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত উপরিউক্ত যে ধারণা উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর চিন্তার মধ্যেই একটা ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে—রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদারনীতির ভারসাম্য।

'রক্ষণশীল উদারনৈতিক' বা 'উদারনৈতিক রক্ষণশীল'—যে ভাবেই তাঁকে অভিহিত করি না কেন মন্তেস্ক্যু যে প্রধানত ব্রিটিশ মডেল অনুযায়ী একটা সাংবিধানিক, সসীম ও সুষম শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ইচ্ছার মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে তিনি সমাজে বিপ্লব সংগঠনের কোন প্রয়োজন না দেখলেও সমাজের (বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় সমাজের) সংস্কার সাধনে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

মন্তেস্ক্যুর মতে এমন কোন সরকার বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই যা সর্বত্র সমানভাবে উপযোগী বলে ঘোষিত হতে পারে। আসলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলো তখনই উপযোগী হয় যখন সেগুলি নির্দিষ্ট সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। একই কারণে বলা যায় এমন কোন আইনবিদ্ বা শাস্ত্রকার নেই যাঁর তৈরী বিধি বা নির্দেশ সর্বজনীন স্বীকৃতি পেতে পারে।

মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতা (Power) ও স্বাধীনতার সম্পর্কের বিষয়টি লক্ষণীয়। তাঁর মতে সর্বাধিক স্বাধীনতা অর্জন তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিমানুষ ও মনুষ্যগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বন্টন হবে। তথাকথিত প্রাকৃতিক অধিকারের ভিত্তিতে কোন স্বাধীনতা অর্জিত হয় না, কিংবা অত্যাচারিত হলেই মানুষ বিদ্রোহে লিপ্ত হয় না। ক্ষমতার সুষম বন্টন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ—এই দুইয়ের ভিত্তিতেই মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশ উপভোগ করতে পারে। মন্তেস্ক্যু বিভিন্ন প্রসঙ্গে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোন স্তরেই ক্ষমতার একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন স্বাধীনতার সহায়ক হবে না। তাই তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যেমন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেছেন তেমনি তিনি জানিয়েছেন যে বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং স্বার্থবাহী গোষ্ঠী ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

মন্তেস্ক্যু যাবতীয় বিধি ও আইনকে ঐতিহাসিক অবস্থান ও বাস্তব সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। যেমন বলা যায়, শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস নিহিত। আবার নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো পৌর আইনের ভিত্তি। সরকারের শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করার ক্ষেত্রেও তাই এই বাস্তব সম্পর্ক তথা আইন ব্যবস্থার গুরুত্ব লক্ষ্য করা যাবে। যেখানে সুনির্দিষ্ট বিধি ব্যতিরেকেই কোন ব্যক্তি শাসন চালায় তাকে একনায়কতন্ত্র despotism বলা যাবে। অপরদিকে ব্যক্তি যখন আইন অনুযায়ী শাসন করে তাকে বলা হবে রাজতন্ত্র বা monarchy। এছাড়া রয়েছে প্রজাতন্ত্র যেখানে জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। মন্তেস্ক্যু প্রজাতন্ত্রের দ্বিবিধ রূপের কথা বলেছেন—গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় ধরনের প্রজাতন্ত্রটিই তাঁর পছন্দের (তাঁর নিজস্ব অভিজাত পটভূমির কারণে)।

মন্তেস্ক্যু বলেন, কোন সরকার যদি তার মৌলিক সমাজগত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয় তবে সেখানে অশান্তি এবং বিদ্রোহ দেখা দেবে। যেমন বলা যায় গণতন্ত্র অচল হবে যদি রাজনৈতিক সদ্‌গুণ এবং সাম্যের ভাব অন্তর্হিত হয়। অভিজাততন্ত্রও বেঁচে থাকতে পারে না যদি শাসক শ্রেণীর মধ্যে পরিমিতি বোধের, সংযমের, অভাব দেখা যায়। আবার রাজতন্ত্র বিনষ্ট হবে যদি শাসকের মধ্যে মর্যাদা-সম্মানের অভাব দেখা দেয়।

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনায় মন্তেস্ক্যুর ভৌগলিক এলাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন, তাঁর মতে খুব বৃহদায়তন রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। মাঝারি আয়তনের রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র এবং ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রই উপযোগী ব্যবস্থা। অবশ্য ব্যবস্থা যাই হোক তা যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তবে মানুষের কাঙ্খিত স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব হয় না। আর এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রসঙ্গেই মন্তেস্ক্যু তাঁর বিখ্যাত 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব' হাজির করেন। মন্তেস্ক্যু বলেন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচ হিসাবে এবং স্বাধীনতার প্রধান শর্ত হিসাবে সরকারের প্রশাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার পৃথকীকরণ প্রয়োজন। সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে একপ্রকার 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি' প্রতিষ্ঠিত হলেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কোন একটি বিভাগকে সর্বোচ্চ ঘোষণা করা যাবে না ; কোন একজন ব্যক্তি একাধিক বিভাগের কাজে অংশগ্রহণ করবে না এবং কোন বিভাগই অন্য কোন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। এই ভাবেই

স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব এবং বিভাগগুলির পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একপ্রকার ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। ঐ ভারসাম্যাবস্থা স্বাধীনতার প্রধানতম শর্ত বলে মন্তেস্ক্যু মনে করেতন।

২.৪ The Spirit of the Laws : রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব

আগস্ত কঁত্ সমাজতত্ত্ব শব্দটি চয়ন করেন ১৮৩০-এর দশকের শেষে। এর প্রায় নয় দশক আগে ১৭৪৮ সালে মন্তেস্ক্যুর ''The Sprit of the Laws'' গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। মন্তেস্ক্যুর এই গ্রন্থে সমাজকে, সমাজ ও রাষ্ট্রিক, নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কগুলো বিশেষভাবে বোধগম্য করানোর চেষ্টা হয়েছে। এককথায় সমাজতত্ত্বের যা উদ্দেশ্য তা এই গ্রন্থে খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী রেমন্ড অ্যারন (Raymond Aron) মন্তেস্কুকে কেবলমাত্র সমাজতত্ত্বের পূর্বসূরী না বলে প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেই চিহ্নত করতে চান। আমরা মনে করি 'The Sprit of the Laws' গ্রন্থে যেভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিদর্শ-প্রকরণ (Ideal types), মানুষের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তাঁকে নিঃসন্দেহে আধুনিক রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (Political Sociology) অগ্রদূত বলে নির্দেশ করা যায়।

মন্তেস্ক্যু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যগুলো অনুধাবন করতে চেয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে সত্যের বৈচিত্রের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মনে করেন সামাজিক মানুষের ভাব-ভাবনা, প্রথা, বিশ্বাস, নৈতিকতা, বিধি-ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। আবার এই অসংলগ্ন বৈচিত্র কিভাবে শৃঙ্খলা আনে সেটা আবিষ্কার করা তাঁর সমাজতত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো অসংলগ্ন ঘটনা, দেখা যাবে তার গভীরে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। তেমনি বলা যায় বাহ্যত যে সীমাহীন বৈচিত্র দেখছি তাকে বোধগম্য করার প্রয়াসে ধারণাগত শৃঙ্খলা (Conceptual order) নির্মাণ করা যেতে পারে। বিশৃঙ্খল, অরাজক, অবস্থাকে মন্তেস্ক্যু কখনও চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে চাননি। তাই দেখা যায় The Spirit of the Laws-এর ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন ''I have first of all considered mankind, and the result of my thoughts has been, that amidst such an infinite diversity of laws and manners, they were not solely conducted by the caprice of fancy.'' অর্থাৎ মানব সমাজে যতই যা বৈচিত্র থাকে না কেন, সবই খেয়ালখুশী নিয়মবহির্ভূত এলোমেলো ব্যাপার এটা মনে করা ঠিক হবে না। 'বৈচিত্র' থাকার অর্থ এমন নয় যে তা ব্যাখ্যার অযোগ্য। বরং দেখা যাবে সব সম্পর্ক, সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত আছে কোন না কোন ভাবে, কিংবা একে অপরের উপর নির্ভর করে আছে বিশিষ্ট এবং সাধারণ বা সামান্য ধর্মীতার সম্পর্ক নিয়ে।

রেমন্ড অ্যাবনের মতে আলোচ্য গ্রন্থটিতে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রসঙ্গে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে দেখা যাবে একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের (Politcal theorist) দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে প্রাচীন ধ্রুপদী গ্রীক্ দার্শনিকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। মন্তেস্ক্যু সরকারের শ্রেণীবিভাগের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তার সঙ্গে অবশ্যই অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বের পার্থক্য রয়েছে। তথাপি এ কথা বলা ভুল হবে না যে সাধারণভাবে ঐ ধ্রুপদী দার্শনিকদের তৈরী ঐতিহ্য অনুসরণ করেই মন্তেস্ক্যু তাঁর শ্রেণীবিভাজনের মডেলটি উপস্থাপিত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি মন্তেস্ক্যু আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে। এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি হ'ল সমাজতাত্ত্বিক

(Sociological) দৃষ্টিভঙ্গি যার যাহায্যে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কিভাবে ধর্ম, জলবায়ু, মৃত্তিকার প্রকৃতি, জনসংখ্যার আয়তন, ইত্যাদি উপাদানগুলো সমষ্টিগত জীবনের বিভিন্ন দিক্‌গুলোকে প্রভাবিত করে। একই গ্রন্থকারের এই দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ও অসংলগ্ন ভাব এনেছে। এই দ্বৈত ভাবের কথা স্বরণে রেখে প্রথমে আমরা তাঁর শ্রেণীবিভাজনের তত্ত্বটি আলোচনা করতে পারি।

মন্তেস্ক্যু সরকারের ত্রিবিধ রূপের কথা বলেছেন ঃ প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। এর প্রত্যেকটি তিনি আবার ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট পরিচালিকা নীতি (Principle) ও প্রকৃতি (nature) অনুযায়ী। Principle বা নীতি বলতে তিনি বিশিষ্ট ভাবানুভূতিকে বুঝিয়েছেন যা নির্দিষ্ট সরকারের অন্তর্গত মানুষদের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজ করবে। যেমন ধরা যাক প্রজাতন্ত্র। এই ব্যবস্থার পরিচালিকা নীতি হ'ল Virtue বা সদ্‌গুণ। এর অর্থ এই নয় যে প্রজাতন্ত্রের সকল মানুষই সদ্‌গুণের অধিকারী। এর অর্থ হ'ল প্রজাতন্ত্র তখনই উন্নত ও বিকাশশীল হবে যখন ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ-এর ভাব প্রাধান্য পেতে থাকবে। Nature বা প্রকৃতি বলতে সেই বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা হচ্ছে যার সাহায্যে নির্দিষ্ট সরকারের ধরনটি চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কারা বা কতজন মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা তথা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করছে তার উল্লেখ করতে হয়। যেমন, প্রজাতন্ত্র হল সেই সরকার যেখানে জনগণ সমষ্টিগতভাবে (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) কিংবা জনগণের নির্দিষ্ট অংশ/গোষ্ঠী (অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ক্ষমতা ব্যবহার করছে। তেমনি রাজতন্ত্র হ'ল সেই ব্যবস্থা যেখানে সুনির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী একজন শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করবে। একনায়কতন্ত্রে যিনি ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন বিধি নেই—একনায়ক শাসন করে নিজ মর্জি অনুযায়ী। প্রজাতন্ত্রে নীতি (Principle) হ'ল সদ্‌গুণ সেকথা আগেই বলা হয়েছে। রাজতন্ত্রের পরিচালিকা নীতি সম্মান-মর্য্যাদা। আর একনায়কতন্ত্রে যে ভাবানুভূতি জনগণের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজ করে তা হ'ল ভয়-ভীতি (fear)।

রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে মন্তেস্ক্যু নীতিগুলির (Principles) অর্থ নিরূপণ করেছেন। প্রজাতন্ত্রে যে সদগুণের কথা বলা হচ্ছে তা নিতান্তই নৈতিকতার (morals) বিষ নয় ; সদ্‌গুণ হ'ল রাজনৈতিক সদ্‌গুণ—আইন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং ব্যক্তির তরফে তার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনা ও সেইমত দায়িত্ব পালন। রাজতন্ত্রে যে সম্মান ও মর্য্যাদার নীতির কথা বলা হচ্ছে তা হ'ল সমাজে ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্তর বা অবস্থানের প্রতি সম্মান / শ্রদ্ধা প্রদর্শন। একনায়কতন্ত্রে যে ভয়-ভীতির ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে তা হ'ল মানুষের এক আদিম ও মৌলিক আবেগের বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই এই মৌলিক ভাবটির উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস হবস ভয়-ভীতিকে অত্যন্ত মৌলিক, মানবিক, ভাবাবেগ বলে নির্দেশ করেছেন। হবস্‌-এর মতে ঐ ভাবাবেগই রাষ্ট্রগঠনের মূলে কাজ করেছে। মন্তেস্ক্যু অবশ্য হবস্‌-এর মত হতাশাবাদী ছিলেন না। যেই কারণে ভয়-ভীতির নীতিকে পরিচালিত একনায়কতন্ত্রকে তিনি কখনই সুস্থ, স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলতে পারেন নি। বরং তিনি বলেছেন, একনায়কতন্ত্র অচিরেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয় এবং এই সরকার বেশী দিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।

মন্তেস্ক্যু সমাজ ও রাষ্ট্রের যে শ্রেণীবিভাজন করেছেন তার পৃথক পৃথক মডেলগুলো এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রজাতন্ত্রের ধরণটি উপস্থাপিত হয়েছে প্রাচীন রোমের প্রজাতন্ত্রের আদলে ; রাজতন্ত্রের মডেল হ'ল তাঁর সমকালীন ইউরোপীয়— বিশেষতঃ ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র ; আর একনায়কতন্ত্রের ধরণটি হাজির করা হয়েছে এশিয়া মহাদেশের শাসনব্যবস্থাগুলি নির্দেশ করে। লক্ষ্য করা দরকার প্রাচ্যবেত্তা পশ্চিমী পন্ডিতবর্গ (Western Orientalists) গত দু'শ / আড়াইশ বছর ধরে ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশের দেশগুলি সম্পর্কে যে সব ধারণা

যে তত্ত্ব, প্রচার করে এসেছেন মন্তেস্ক্যুকে তাঁদের এবং তাঁদের তত্ত্বের পূর্বসূরী বললে অত্যুক্তি হবে না। অর্থাৎ অন্যান্যদের মত তিনিও এশিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগত না হয়েই কিছু বদ্ধমূলক ধারণা হাজির করেছেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে এশিয়ার দেশগুলিতে ন্যায়নীতি বা আইনব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না ; শাসক তার খেয়ালখুশীমত ক্ষমতা ব্যবহার (অপব্যবহার) করেন।

মন্তেস্ক্যুকৃত রাষ্ট্রীয় সমাজরে শ্রেণীবিভাজন তত্ত্বের আর একটি ত্রুটি হ'ল তার নিয়তিবাদ। কেননা তিনি যেভাবে আয়তন, জলবায়ু ইত্যাদির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাগুলোর প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন তাতে এটাই প্রকট হয় যে সরকার বা শাসনব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে মানুষের কোন পরিকল্পনার / প্রচেষ্টার অবকাশ নেই। এলাকা বৃহদায়তন হলেই যেন অনিবার্যভাবে সেখানে despotism বা একনায়কতন্ত্র দেখা দেবে। Raymond Aron তাই বলেছেন, ''In so far as it porits a relation between the dimension of the territory and the form of Government, Montequieu's theory of Government risks leading to a sort of fatalism.''

মন্তেস্ক্যুর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা'। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডই তাঁর মডেল। আর এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হ'ল নির্বাচিত সংস্থা, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, ইংল্যান্ডেরই অবদান। উপরন্তু সেই দেশে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আইনবিভাগীয় ক্ষমতায় থেকে পৃথক রেখে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। মনে রাখতে হবে মন্তেস্ক্যু ঠিক আইনশাস্ত্রের নিরিখে (বা বিচারে) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেন নি। ক্ষমতা হ্রাস করে নয়, ক্ষমতার ভারসাম্য করেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে— এরূপই ছিল মন্তেস্ক্যুর ভাবনা। রাষ্ট্র ও সমাজ তখনই স্বাধীন যখন একটি ক্ষমতার কেন্দ্র অপর একটি ক্ষমতার কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে, কোন ক্ষমতার কেন্দ্রই চূড়ান্ত বলে দাবী জানাতে পারছে না।

মন্তেস্ক্যুর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার এক কেন্দ্রীয় অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। কেবল সংস্থাগত ক্ষমতার ভারসাম্য নয়, মন্তেস্ক্যু লক্ষ্য করেছেন ইংল্যান্ডে সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যেও ক্ষমতার ভারসাম্য রয়েছে। আর তার জন্যই ঐ দেশে এক স্বাধীন ও নরমপন্থী শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্তেস্ক্যুর মতে সুশাসন অবশ্যই moderate বা নরমপন্থী শাসন। এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মনে ভয়-ভীতি প্রাধান্য পাবে না এবং কোন স্তরেই একচেটিয়া ক্ষমতার প্রবল প্রকাশ ঘটবে না। রেমন্ড অ্যারনের মতে এই সামাজিক ভারসাম্য ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার মডেলটি উপস্থাপিত করতে গিয়ে মন্তেস্ক্যু বস্তুতপক্ষে অভিজাততান্ত্রিক প্রজতন্ত্রের কথাই প্রচার করেছেন (ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য দেখেছেন)। তবে অভিজাততন্ত্রের প্রতি তাঁর যতই দুর্বলতা থাক্ না কেন নাগরিকের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এবং আইনব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম এই সব কিছুর শর্ত হিসাবে তিনি যে কোন ক্ষেত্রেরই সীমাহীন ক্ষমতার (unlimited power) অবস্থান বিলুপ্ত করে সকল প্রকার ক্ষমতা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার কথা বলেন।

সমালোচকগণ মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বে কিছু স্ববিরোধী অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। শাসনব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজন করতে গিয়ে তিনি despotism বা একনায়কতন্ত্রকে মানুষের প্রকৃতি-বিরোধী ব্যবস্থা (contrary to human nature) বলে চিহ্নিত করেছেন। অথচ তিনি এই একই পুস্তকে লিখছেন বিস্তৃত এলাকা, বৃহৎ সমষ্টি এবং কিছু বাহ্যিক উপাদানের জন্য অনিবার্য ভাবেই একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। রেমন্ড অ্যারন তাই প্রশ্ন তুলেছেন, ''can a sociologist maintain that a form of government which under certain conditions is inevitable is contrary to human nature?''

বাহ্যিক উপাদান বলতে মন্তেস্ক্যু বিশেষভাবে জলবায়ুর (climate) কথা উল্লেখ করেন। মানুষের মেজাজ-মর্জি

ও ভাব-অনুভূতি জলবায়ুর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। মন্তেস্ক্যু বলেন, যতই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ততই মানুষের ভাব-অনুভূতিগুলো প্রখর হয়, আকর্ষণীয় হয়। অবশ্য জলবায়ুর প্রভাবকে তিনি কোন নিয়ন্ত্রণবাদী (determinist) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পেশ করেন নি। বরং জাতীয় জনসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি এই গ্রন্থের অন্যত্র একপ্রকার বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছেন। মন্তেস্ক্যু লিখেছেন, ''Mankind is influenced by various causes : by climate, by religion, by laws, by maxims of government, by precedents, morals and customs; whence is formed a general spirit of nations.'' (অর্থাৎ কোন জাতি-রাষ্ট্রের চরিত্র গঠনে যেমন প্রথা, নৈতিকতা, চিরাচরিত ভাবধারা ইত্যাদির অবদান থাকে তেমনি জলবায়ু, ধর্ম, আইন এই সব উপাদানও সক্রিয় থাকে)।

২.৫ বৈচিত্র-বিশৃঙ্খলা থেকে সংহতি ঃ মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের মূল কথা

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রেমন্ড অ্যারন মন্তেস্ক্যু সম্পর্কে বলেন ঃ ...Montesquieu the sociologist was first and foremost intensely aware of human and social deversity. For him, the problem was to create order in an apparent chaos.'' অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিক মন্তেস্ক্যুর প্রথম এবং সর্বপ্রধান পরিচয় হ'ল মানবিক তথা সামাজিক বৈচিত্র সম্পর্কে গভীর সচেতনা। মন্তেস্ক্যুর কাছে মূল সমস্যা ছিল আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করা। সমাজ ও রাষ্টব্যবস্থার (শাসনব্যবস্থার) নানাবিধ শ্রেণী-প্রকরণের ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি সেই সংহতি নির্মাণের কাজে সফল হয়েছিলেন বলা যায়। তিনি তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন বৈচিত্র ও বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করে। অতঃপর সরকারের শ্রেণীবিভাজন তত্ত্ব, বিভিন্ন জনসমষ্টির উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানের নির্দেশ, সর্বজনীন কিছু নীতির উপস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি মানবসমাজের ঐক্যসাধনকারী প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মন্তেস্ক্যুর রচনায় যেভাবে বিশুদ্ধ সমাজতত্ত্বের তুলনায় রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে তাতে পূর্বোক্ত ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহকেই নির্দেশ করা যায়। মন্তেস্ক্যু তাঁর সমাজদর্শনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটিকে। স্বাধীনতা অর্জন ও উপভোগের মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য প্রকাশ পায়। আর সেই কাজে শাসনব্যবস্থার ভূমিকাই প্রধান। তিনি দেখিয়েছেন কি বিশেষ বিশেষ নীতির ভিত্তিতে এক একটি শাসনব্যবস্থা কার্যকরীভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং সামাজিক ভারসাম্য ও ঐক্য সাধনে সক্ষম হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সমাজে যাবতীয় বিশৃঙ্খলার জন্য মন্তেস্ক্যু দায়ী করেছেন ক্ষমতা-কেন্দ্রীভবনের প্রবণতাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পথেও প্রধান প্রতিবন্ধকতা হ'ল ক্ষমতার কেন্দ্রীভভন। আর এই কারণেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বললেন মন্তেস্ক্যু। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা / বিভাগের ক্ষমতা (ও দায়িত্বের) পৃথকীকরণ এবং তার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণীগুলোর শক্তির ভারসাম্য তৈরী করা—এরূপই ছিল মন্তেস্ক্যুর প্রস্তাব। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল ঐ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মানুষের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে, তেমনি অপরিদেক রাষ্ট্রীয় সমাজে শ্রেণীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক আক্রমণের বদলে একটি সংহতি আনয়নকারী প্রবনতা জোরদার হতে থাকবে। সমাজে বাহ্যত যে সীমাহীন এবং অর্থহীন, অসংলগ্ন, বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটে সেটাই সমাজের প্রকৃত চেহারা নয়। একজন সমাজতাত্ত্বিকের কাজ হ'ল যে সম্পর্কগুলো, যে প্রক্রিয়াগুলো আপাত অসংলগ্ন সেগুলোকে বোধগম্য করে তোলা। মন্তেস্ক্যু এই করেছেন। আর সেটা সুসম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি সামাজিক ও মানবিক ঐক্য/সংহতির প্রক্রিয়াকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'The Spirit of the Laws' গ্রন্থে 'Spirit' বলতে মন্তেস্ক্যু বুঝিয়েছেন যে কোন আইন ব্যবস্থা বা বিধিব্যবস্থার নির্দিষ্ট চরিত্রকে। বিধিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন নির্দেশ এবং সমগ্র বিধিব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি সমাজের সঙ্গে অপর কোন সমাজের পার্থক্য নির্দেশ এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্রও প্রকট হবে। অধুনা আমরা যাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি (বা Political culture) বলি এক হিসাবে মন্তেস্ক্যু 'Spirit' বলতে সেটাই বুঝিয়েছেন। মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বে সেই 'Spirit' বা সংস্কৃতিকে (ব্যবস্থার চরিত্রগত ধারাটিকে) সম্যক উপলব্ধি করে এবং সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থাগত ভারসাম্য সৃষ্টি করে সঠিক সংহতি সাধনের কথা বলা হয়েছে।

২.৬ সারাংশ

সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যেমন নিবিড় তেমনি সমাজতত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কও গভীর। আর এই গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যাবে বিশিষ্ট ফরাসী পন্ডিত মন্তেস্ক্যুর রচনায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবেই অধিকতর পরিচিত থাকলেও মন্তেস্ক্যুকে প্রথম সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থটিকে অনায়াসে "রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব" সংক্রান্ত প্রথম রচনা বলা যেতে পারে।

মন্তেস্ক্যু সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে মানুষের সাধারণ প্রকৃতি ও চরিত্রের এক ধারাবাহিকতায় তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তাই দেখা যায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সমাজ পরিবর্তনের কোন তত্ত্ব তাঁর রচনায় নেই।

মন্তেস্ক্যুর মতে সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনই হল শ্রেষ্ঠ জীবন। প্রাচীন রোমের উত্থান পতনের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সদ্‌গুণের অভাবই রোমের পতন প্রক্রিয়া নির্দেশ করছে। এই ইতিহাস দর্শন মন্তেস্ক্যু নানা প্রশ্নে প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁর "The Spirit of the Laws" গ্রন্থে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ধরন বা শ্রেণীর প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্বপরিকল্পনা মত উত্থান-পতন প্রক্রিয়া নির্দেশকারী ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন নি। পরিবর্তে কিছু আদর্শ বর্গের (Categories) ভিত্তিতে তিনি তুলনামূলক আলোচনা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি সমাজতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত করেছেন নিজের অজান্তেই।

পরবর্তীকালে ডুর্খাইম যাকে সামাজিক বস্তুসত্য (Social fact) বলেছেন মন্তেস্ক্যুর রচনায় সেই সব বাস্তব ঘটনা ও অবস্থানকে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রেণীবিভাজন এবং তুলনামূলক আলোচনাকে মন্তেস্ক্যু সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছিলেন। মন্তেস্ক্যুর typology বা প্রকরণ-বিন্যাস পরবর্তীকালে মার্ক্স হ্বেবরের নিদর্শ-প্রকরণ (Ideal type) গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

আইনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি (Spirit) আলোচনা করতে গিয়ে মন্তেস্ক্যু সদ্‌গুণ, সম্মান-মর্য্যাদা ও ভীতি এই ত্রিবিধ নীতির উল্লেখ করেন। পরিচালিকা নীতি হিসাবে এগুলি এক এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নির্দেশ করবে। রাষ্ট্রব্যস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের স্বাধীনতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রজাতন্ত্র স্বাধীন পরিবেশ আনে। একনায়কতন্ত্রে স্বাধীনতার বিলুপ্তি হয়। স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন্তেস্ক্যু ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করেন। শাসনব্যবস্থায় একচেটিয়া

ক্ষমতার আবির্ভাব ঘটলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়। ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় থাকলে স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মন্তেস্ক্যুর "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বটি" বিবেচনা করা যায়। এক বিভাগের ক্ষমতা অপর এক বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ ক্ষমতার ভারসাম্য রাষ্ট্রীয় সমাজের উৎকর্ষকে নির্দেশ করবে।

মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রতত্ত্বে ভৌগলিক উপাদানের গুরুত্ব লক্ষ্য করার মত। রাষ্ট্রীয় এলাকার আয়তন এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতির যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর মতে সুশাসন, স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র এ সবকিছু ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে মন্তেস্ক্যু সদ্‌গুণ, মর্য্যাদা ইত্যাদি নীতির অর্থ নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। এখানে মন্তেস্ক্যুর চিন্তায় কিছু স্ববিরোধী অবস্থানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ধরনের নিয়তিবাদ (determinism) আশ্রয় নিয়েছে তাঁর তত্ত্বের। তিনি প্রাথমিকভাবে সদ্‌গুণ, মর্য্যাদা, ভয় ইত্যাদি কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন করেছিলেন। অথচ অন্যত্র আবার আয়তন, জলবায়ু ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থার অনিবার্য্য তার কথা বলেছেন।

মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হ'ল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এই ব্যাপারে রেমন্ড অ্যারন বলেছেন সামাজিক সংহতি সাধনের প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান মন্তেস্ক্যুকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। মন্তেস্ক্যুর শুরু করেছিলেন বৈচিত্রের উল্লেখ করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যের পথ খোঁজা। বৈচিত্রের মধ্যে সংহতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা— এই দৃষ্টিভঙ্গি মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বকে অনন্যসাধারণ চরিত্র দান করেছে।

২.৭ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(১) মন্তেস্ক্যুর সমাজদর্শনের প্রধান বক্তব্যটি আলোচনা করুন।

(২) মন্তেস্ক্যুর ইতিহাস দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করুন।

(৩) মন্তেস্ক্যুর রাষ্ট্রচিন্তায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিতভাবে উত্তর দিন

(১) মন্তেস্ক্যুর রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (প্রধান) প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করুন।

(২) মন্তেস্ক্যু কৃত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(৩) মন্তেস্ক্যুর সমাজতত্ত্বের যে এক স্ব-বিরোধী অবস্থানের কথা সমালোচকগণ উল্লেখ করে থাকেন তার সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) R. G. Gettell— *History of Political Thought.*

(২) Raymond Aron— *Main Currents in Sociological Thought.* (Vol.I)

(৩) Irving M. Zeitlin— *Ideology and the Development of Sociological Theory.*

একক ৩ ❐ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অগ্রদূত (সাঁ সিমঁ 'আগস্ত কঁত্)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ সাঁ সিমঁ (Saint Simon) ঃ ১৭৬০—১৮২৫
৩.৩.১ বিজ্ঞানবাদ (Positivism)
৩.৩.২ সমাজ-কাঠামো ও সমাজতন্ত্র
৩.৩.৩ ইতিহাস দর্শন, আন্তর্জাতিকবাদ ও ধর্ম
৩.৪ আগস্ত কঁত্ (Auguste Comte) ঃ ১৭৯৮—১৮৫৭
৩.৪.১ বিজ্ঞানবাদী দর্শন (Positive Philosophy)
৩.৪.২ সামাজিক-বৌদ্ধিক বিবর্তনের তত্ত্ব ঃ ত্রিস্তর প্রগতির বিধি
৩.৪.৩ বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্য্যায়
৩.৪.৪ সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা
৩.৪.৫ সদর্থক মানবতাবাদ ও ধর্ম
৩.৫ সারাংশ
৩.৬ অনুশীলনী
৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্বের গোড়াপত্তন করলেন তাঁদে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে ;
- সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অন্যতম অগ্রদূত সাঁ সিমঁ কিভাবে মন্তেস্ক্যুর মতই রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজ চিন্তার মিলন ঘটিয়েছেন তা বুঝতে পারা যাবে ;
- আপনি জানতে পারবেন কেন সাঁ সিমঁকে একইসঙ্গে 'সমাজতত্ত্ব' ও 'সমাজতন্ত্র'-এর (Sociology and Socialims) জনক বলা হয় ;
- Positivism বা বিজ্ঞানবিদ্ সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে ;
- আগস্ত কঁত্-এর 'সদর্থক সমাজদর্শন' সম্পর্কে ধারণা করা যাবে ;
- কঁত-এর বিভিন্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পাওয়া যাবে এবং
- সর্বোপরি কিভাবে শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বের ও সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে তা উপলব্ধি করা যাবে

[দেখা যাবে যে, সাঁ সিমঁ ও আগস্ত কঁত্ উভয়েই শিল্প-সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা জরুরী বলে মনে করেছেন।]

৩.২ প্রস্তাবনা

ফরাসী চিন্তানায়কগণই সমাজতত্ত্বের আদিপুরুষ এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। মন্তেস্ক্যুর কথা আমরা আগেই বলেছি। এবার আমরা আরো দু'জন ফরাসী পন্ডিতের কথা আলোচনা করব। এদের মধ্যে একজন আগস্ত কঁত্ যিনি 'সমাজতত্ত্ব' নামটাই প্রথম চয়ন করেন। অপরজন সাঁ সিমঁ যিনি একাধারে সমাজতাত্ত্বিক এবং সমাজতন্ত্রী।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে শিল্প সমাজ গড়ে উঠছিল এঁরা দু'জনই তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অবশ্য দু'ভাবে। কঁত্ শিল্পসমাজকে আধুনিক যুগের অনিবার্য এবং সদর্থক ব্যবস্থা হিসাবে অভিনন্দিত করেছেন। অপরদিকে সাঁ সিমঁ (যাঁকে সকল অর্থেই কঁত্-এর গুরু বলা যায়) আধুনিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে পুরাতন সামন্তব্যবস্থার তুলনায় অনেক অগ্রসর বলে ঘোষণা করেন। উপরন্তু সাঁ সিমঁ দাবী জানিয়েছিলেন যেন শিল্পসমাজে মেহনতী মানুষের মর্য্যাদা ও কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি এই সহানুভূতির জন্য সাঁ সিমঁ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী কার্ল মার্ক্স-এর প্রশংসা অর্জন করেছেন। কার্ল মার্ক্স তাঁকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অগ্রদূত তথা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের (Utopain Socialists) মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে উভয়ে মিলে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সূচনা করেছিলেন। সমাজের সদর্থক, বিজ্ঞানবাদী (পজিটিভিষ্ট) আলোচনা-পর্য্যালোচনা যে সম্ভব এবং জরুরী এ কথা এঁরা দু'জনেই প্রথম জোরালভাবে হাজির করেন। শিল্পায়নের ধারায় এঁরা নতুন এবং উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠনের কথা আলোচনা করেছেন। অবশ্য এখানেও আমরা উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করব। কেননা সমাজ গঠনে সাঁ সিমঁ যেখানে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কঁত্-এর ক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাবে অপেক্ষাকৃত এলিটবাদী (Elitist) দৃষ্টিভঙ্গি।

উভয় চিন্তানায়কই সঙ্গত কারণে ধর্ম এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রসঙ্গে এনেছেন তাঁদের নানা রচনায়। নতুন সমাজ গঠনে প্রসঙ্গগুলো বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলেই তাঁরা মনে করেছেন। বর্তমান এককের বিভিন্ন অংশে এই সব বিষয়গুলো আলোচিত হবে। সর্বোপরি আগস্ত কঁত্ যে সব তত্ত্ব ও ধারণার (Theory and Concept) সাহায্যে সমাজতত্ত্বের উদ্বোধন করেছেন সেগুলি সবই পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হবে।

৩.৪ সাঁ সিমঁ (Saint Simon) ঃ ১৭৬০—১৮২৫

সাঁ সিমঁ ছিলেন সেই ধরনের মানুষ যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক ধারাকে মেনে নিয়ে কাম্য ও কাঙ্খিত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে চান, কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডগুলোর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেন না। কিশোর বয়সে আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যুবক বয়সে যখন তাঁর নিজের দেশেই সেই অসাধারণ বিপ্লবটি সংঘটিত হচ্ছে (১৭৮৯ সাল থেকে) তখন কিন্তু জঙ্গী, আক্রমণাত্মক কর্মকান্ড দেখে তিনি কিছুটা নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন। তিনি অবশ্য পরিবর্তনের পক্ষেই ছিলেন। মধ্যবয়সে আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে সাঁ সিমঁ বলেন, ''...I was convinced that the 'Ancient Regime'

could not be prolonged, and on the other, I had an aversion to destruction.'' অর্থাৎ তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ফ্রান্সের পুরনো জমানার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, অথচ এটাও ঠিক যে ধ্বংসাত্মক কর্মে তাঁর তীব্র অনীহা। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ফ্রান্সের জ্ঞানদীপ্ত ধারা রোমান্টিক বিপ্লবের ধারা উভয়ের মিলিত প্রভাবেই তৈরী হয়েছিল সাঁ সিমঁ-এর সমাজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সাঁ সিমঁ মনে করেন পুরনো সমাজের জঠরে সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু শক্তি যা ইউরোপীয় সমাজে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কারণস্বরূপ। নতুন যে শক্তিগুলো প্রকাশ পাচ্ছিল তার মধ্যে সাঁ সিমঁ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্পপতি বুর্জোয়া ও বণিক বুর্জোয়ার আগমন, প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন, জ্ঞানদীপ্ত আন্দোলন ইত্যাদি শক্তিকে। এদের মধ্যে তিনি জ্ঞানদীপ্ত ধারার কর্মকান্ডকে নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক বলে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে পুরনো সমাজ ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করলেও এই জ্ঞানদীপ্ত ধারা সমাজ পুনর্গঠনে তথা নতুন সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন সদর্থক সহায়তা করে না। নতুন (উনবিংশ) শতাব্দীতে সাঁ সিমঁ তাঁর সমসাময়িকদের স্মরণ করিয়ে দেন গঠনমূলক দায়িত্ব পালনের কথা, বিদ্রোহ-বিপ্লব বর্জন করে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্রিয়ায় নিজেদের নিযুক্ত রাখার কথা।

৩.৩.১ বিজ্ঞানবাদ (Positivism)

সাঁ সিমঁ বলেন উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ এক বিজ্ঞানবাদী স্তরের মুখোমুখী। এই স্তর যেমন সামাজিক স্তর, শিল্পসমাজের স্তর, তেমনি এই বিজ্ঞানবাদী স্তর হল মানুষের জ্ঞানের আধুনিকতম স্তর। মানুষের সমাজকে, মানুষের সামাজিক জীবন ও আচরণকে বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। ধর্মীয় মতান্ধতার বদলে বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য মেনে চলতে হবে। ফলতঃ মধ্যযুগে যে পুরোহিত শ্রেণী ও অভিজাত গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন ছিল তাদের বদলে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিরা নতুন যুগের স্বাভাবিক নেতৃত্বের মর্য্যাদা পাবে। নতুন নেতৃত্বের বিশিষ্টতা হ'ল প্রাকৃতিক/পার্থিব বিষয়ের সকল ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মানবিক প্রসঙ্গগুলিতেও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

ধর্মের জায়গায় স্থান পাবে বিজ্ঞান। সাঁ সিমঁ যে ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি এঁকেছেন তাতে এই পরিবর্তনটাই প্রধান। একসময় ধর্মই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল। আধুনিক মানুষকে সংঘবদ্ধ রাখবে বিজ্ঞান। সমাজগঠন ও নিয়ন্ত্রণে পুরোহিতদের বদলে আসবে বিজ্ঞানীদের, আর সামন্তপ্রভুদের জায়গায় আসবে শিল্পপতিরা। এটা মনে হতেই পারে যে সাঁ সিমঁ আসলে সম্পত্তির মালিকদের সঙ্গে (শিল্পপতিদের সঙ্গে) বুদ্দিজীবীদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে স্থিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। সাঁ সিমঁ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এমিল ডুর্খাইম বলেছেন, ''...the idea, the word, and even the outline of positivist philosophy are all found in Saint Simon.'' অর্থাৎ দৃষ্টবাদী (বিজ্ঞানবাদী) দর্শনের যা কিছু সবই সাঁ সিমঁ-এর অবদান। অতএব যে কৃতিত্ব আগস্ত কঁত্‌কে দেওয়া হয় তার প্রায় সবটাই সাঁ সিমঁ-এর প্রাপ্য এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। যেমন, কঁত্-এর নামে প্রচলিত ইতিহাসের ত্রিস্তর বিধির যে তত্ত্ব, যেখানে তৃতীয় বা আধুনিক স্তরটিকে positive বা সদর্থক (বিজ্ঞানবাদী) বলা হচ্ছে সেটাও খুঁজে পাওয়া যাবে সাঁ সিমঁ-এর 'Letters from an Inhabitant of Geneva' নামক রচনায়।

আধুনিক দৃষ্টবাদী, সদর্থক, বিজ্ঞান-এর স্তরে এক উন্নত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলে সাঁ সিঁম মনে করতেন। বাস্তবিকপক্ষে পুরনো সামন্তমধ্যযুগীয় ব্যবস্থার একটি দিক্ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

সেটা হ'ল চার্চ ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা মধ্যযুগের এক ধরনের আন্তর্জাতিকতা। অবশ্যই তিনি আন্তর্জাতিকতার আকর্ষণে পিছনে ফিরতে চান নি। তিনি জানিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পর্যায়ে নতুন কোন নীতির উপর দাঁড়িয়েই নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী করতে হবে। তাঁর মতে বিজ্ঞান ও দৃষ্টিবাদী দর্শন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরী করে ইউরোপের জাতি রাষ্টগুলোকে সংহত রাখতে পারবে। তাঁর এরূপ ধারণা ছিল যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে ইউকোপের সমাজগুলিতে কোন স্থিতি আসবে না।

সাঁ সিমঁ-এর মতে ইউরোপীয় সমাজগুলির পরিবর্তনের মূলে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর অগ্রগতি। নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগে সমাজগুলো নতুন করে গঠিত এবং সংহত হয় এবং আধুনিককালে সেই সংহতি জোরদার হয় কেবলমাত্র দৃষ্টিবাদী (বিজ্ঞানবাদী) দর্শনের প্রয়োগে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রাশাখা সমাজে বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিজ্ঞান, যা কিনা 'মানব-বিজ্ঞান', সেটাই এখনও ঠিকমত গড়ে ওঠেনি—এই বলে সাঁ সিমঁ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্থাৎ প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোর আদলে এই মানবিজ্ঞান তৈরী করতে হবে। সমাজ বিকাশ, সমাজ বিবর্তন ও সমাজ প্রগতির বিধি আবিষ্কার করাই হবে এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এই সব বিধি আবিষ্কৃত হলে অতীত ও বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ সম্ভব হবে।

৩.৩.২ সমাজ-কাঠামো ও সমাজতন্ত্র

সাঁ সিমঁ বলেন সমাজে দু'ধরনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এক, যারা উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত (Producers), দুই, যারা অলস এবং ভবঘুরে (Idlers)। প্রথম শ্রেণীর মানুষদের তিনি আবার অনেক উপগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, যেমন—ব্যাঙ্ককর্মী, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, পরিচালনবিদ্, কায়িক শ্রমদানকারী কর্মী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে কার্ল মার্ক্স সমাজতন্ত্রের পূর্বসূরীদের মধ্যে সাঁ সিমঁ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাজনকে নিতান্তই নিম্নমানের চিন্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। মার্ক্স বলেন, শিল্প সমাজের শ্রেণী-কাঠামো তথা সমাজ-কাঠামোর বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজের সম্পত্তির কাঠামোর কথা এবং মানুষের তৈরী বৈষম্যের বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। সাঁ সিমঁ সম্পত্তি ব্যবস্থার তথা বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শ্লোগান তোলেন নি। সাম্যের আদর্শ নিয়েও তিনি পৃথক কোন বক্তব্য রাখেন নি। তিনি কেবল মনে করেছিলেন উৎপাদনের যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনার সাহায্যেই সমাজ জীবনের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম পুর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত হলেও সাঁ সিমঁ মেহনতী মানুষের স্বার্থকে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন বা সমাজদর্শনে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। কার্ল মার্ক্স জানাচ্ছেন, একমাত্র 'New Christianity' নামক সাঁ সিমঁ-এর সর্বশেষ রচনায় মেহনতী মানুষের মুক্তির কথা ঘোষিত হতে দেখা যায়। অন্যান্য গ্রন্থে বুর্জোয়ার অগ্রগতিকেই স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। সময়ের হিসাবে তিনি হয়ত ঠিকই বলেছিলেন কারণ সাঁ সিমঁ-এর সময়েও বুর্জোয়ার প্রগতিশীল চরিত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে। অন্ততঃ তখনও পর্য্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লবের ধারণা গড়ে ওঠার অবস্থা তৈরী হয় নি।

সাঁ সিমঁ যেভাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেছেন সেটা মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাঁ সিমঁই প্রথম বুঝেছিলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানের কাজটাই রাষ্ট্র ও রাজনীতির আসল কাজ। তিনি বলেন, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অভিন্নরূপ ভাবতে হবে—কেননা, রাজনীতি

হ'ল উৎপাদন কর্মের বিজ্ঞান। এঙ্গেলস সাঁ সিমঁ-এর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে সাঁ সিমঁ-এর কাছে তাঁর এবং তাঁর বন্ধু কার্ল মার্ক্সের ঋণ স্বীকার করেন।

৩.৩.৩ ইতিহাস দর্শন, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও ধর্ম

হেগেল ইতিহাসকে যুক্তির বিকাশ বলে নির্দেশ করেছেন। সাঁ সিমঁ 'যুক্তি'র বদলে 'বৈজ্ঞানিক চিন্তা'র উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় হেগেলের মতই তিনিও বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিকাশের কথা বলেছেন। আবার হেগেলের মতই সাঁ সিমঁ বিকাশ ও প্রগতির ধারাকে বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর পরিণতি বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রত্যেক সমাজব্যবস্থা অগ্রগতির একটা পর্য্যায়ে পরিণত (nature) অবস্থান প্রদর্শন করে। আর ঐ পরিণত পর্য্যায়টাই হল তার পতন বা অবনয়নের প্রথম ধাপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন দশম শতাব্দী নাগাদ ইউরোপের সামন্তবাদ একটা পরিণত পর্য্যায়ে পৌঁছায়। এবং তার থেকেই সামন্ত ব্যবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায় ; সেই পতন প্রক্রিয়া অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে অর্থাৎ নতুন বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক পর্য্যায়ের জন্ম দিয়েছে। সামন্ত সমাজের জঠরেই বিজ্ঞান ও শিল্পব্যবস্থার উদ্ভব এবং সেই শক্তির বিকাশের ফলেই পুরনো সামন্তকাঠামো ভেঙ্গে নতুন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর আগমন। বলা বাহুল্য সাঁ সিমঁ-এর এই ইতিহাসতত্ত্ব কার্ল মার্ক্স কৃত সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সাঁ সিমঁ বিপ্লবকে প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য্য বলেছেন ; আবার একইসঙ্গে তিনি বিপ্লবীদের সমালোচনাও করেছেন। তাঁর মতে নতুন ব্যবস্থা কি হবে তা সঠিক নির্দ্ধারণ না করে পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়াটা অস্থিরতা এবং অযৌক্তিকতার প্রকাশমাত্র। তিনি বিপ্লবের বিরোধী নন ; বিপ্লবীরা যে অবস্থায় যেভাবে জঙ্গী আক্রমণাত্মক ক্রিয়ায় মেতেছিলেন তিনি তারই বিরোধিতা করেছেন মাত্র। তাঁর মতে ঐ প্রস্তুতির অভাবের জন্যই বিপ্লব সাফল্য পেল না, একটা সদর্থক পর্য্যায়ে তা উন্নীত হ'ল না। বিপ্লবীরা তাদের ধ্বংসাত্মক, সমালোচনামূলক ও নেতিবাচক অবস্থান অতিক্রম করে সদর্থক, বিজ্ঞানবাদী স্তরটির সন্ধান পেল না। তাই নতুন যুগে নতুন সমাজ গঠনের জন্য নতুন মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে সাঁ সিমঁ মনে করেছেন। বিজ্ঞানবাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সদর্থক ও গঠনমূলক ক্রিয়ায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান।

নতুন সমাজ গঠনের প্রসঙ্গেই সাঁ সিমঁ তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রস্তাবটি হাজির করেন। তিনি বলেন একটিমাত্র দেশে পৃথকভাবে নতুন সমাজে উত্তরণ সম্ভব হবে না। বিশেষতঃ ইউরোপে সমাজগুলো নানাভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত তাই সেখানে জাতিগুলোর এক অভিন্ন সংস্থা / সংগঠন তৈরী করা একান্তই জরুরী। নিরাপত্তার কারণে উৎপাদন কর্মে নিরাপত্তা— এবং মুক্ত বিনিময় ব্যবস্থার স্বার্থে ইউরোপের দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অধুনা আমরা যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংগঠিত হতে দেখছি তাতে যেন দু'শ বছর আগেকার সাঁ সিমঁ উল্লিখিত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতাবাদেরই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। সাঁ সিমঁ ইউরোপীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেছিলেন, ''The producers of all ands are...essentially friends'' তিনি অবশ্যই 'এক জাতি একরাষ্ট্র' ধরনের শ্লোগানের সম্ভাবনা বিচার করে দেখেন নি, হিটলার, মুসোলিনীর মত উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট নেতৃত্ব কিভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের যাবতীয় ভাবনা আদর্শকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তাও নিশ্চিত তাঁর কল্পনায় আসে নি। তবে যে কথা আমরা একটু আগেই জানিয়েছি, এই একবিংশ শতকের প্রারম্ভে নতুন করে আবার সাঁ সিমঁ-এর আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন"-এর মত প্রচেষ্টাগুলি।

সাঁ সিমঁ বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিকে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতিষেধক মনে করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আধুনিক গবেষকগণ ও বিজ্ঞানীরা এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তুলতে পারবেন যেখানে সমাজের ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং একটা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পাবে।

'Industrial System' এবং 'The New Christianity' নামক গ্রন্থগুলিতে সাঁ সিমঁ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মনে হয়েছে শান্তিস্থাপন কিংবা ঐক্য সৃষ্টির জন্য শেষ পর্য্যন্ত নৈতিক ভাবানুভূতির (moral sentiments) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এই হিসাবে তাঁর সমকালীন হিতবাদী (utilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিলেন। নৈতিক সংহতির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাঁ সিমঁ-এর ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক এবং সর্বব্যাপী। এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ তিনি উপস্থাপিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন যেখানে বস্তু এবং ভাব মিলে একাকার। আর নৈতিকতার প্রসঙ্গে তিনি অবশ্যই সেক্যুলর (Seculer) বা অনাধ্যাত্মিক বিষয়গুলোই নির্দেশ করেছেন। মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চার্চের শিক্ষা ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে নতুন ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছিল তারই এক ধরনের প্রকাশ ঘটেছিল সাঁ সিমঁ-এর সর্বশেষ রচনাগুলিতে।

আমরা লক্ষ্য করব সমাজতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধক আগস্ত কঁত্-এর রচনায় উপরিউক্ত সাঁ সিমঁ কৃত তত্ত্ব ও ধারণাগুলো আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভাষ্যকারগণ অনেকেই বলেন, কঁত্ বিশেষ কোন ঋণ স্বীকার না করেই সা সিমঁ-এর ধারণাগুলো নিজের নামেই প্রকাশ করেছেন। অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে সেই কুম্বিলক আগস্ত কঁত্-এর তত্তচিন্তা আলোচনা করেই আমরা সমাজতত্ত্বের গোড়ার কথা জানবার চেষ্টা করব।

৩.৪ আগস্ত কঁত্ (Auguste Comte) ১৭৯৮-১৮৫৭

আগস্ত কঁত্-এর নাম সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর অবদানগুলির অন্যতম হ'ল সমাজচর্চাকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য উদ্যোগী হওয়া। সমাজতত্ত্ব কথাটি যেমন তিনিই প্রথম চয়ন করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তেমনি সমাজব্যবস্থা নিয়ে প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী বিদ্যাচর্চা গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়েও তিনিই প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দাবী করেছেন যে সমাজতত্ত্বকে Positive Science বা সদর্থক বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি মানব-সমাজের ত্রিবিধ পর্য্যায়ভিত্তিক বিবর্তনের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন তাতে আধুনিকতম পর্য্যায়টির নামই হ'ল Positive stage বা বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায়। এছাড়া তাঁর বিজ্ঞানের ক্রমপর্যায় (Hierarchy of Sciences)-এর তত্ত্ব, সামাজিক বলবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যার তত্ত্ব (Social Dynamics and Social Statics) ইত্যাদি তাত্ত্বিক আলোচনাতেও দৃষ্টিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়েছে।

সাঁ সিমঁ-এর মতই আগস্ত কঁত্ ও ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক আক্রমণাত্মক কর্মকান্ডগুলো সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি তাই বলেন, বিপ্লবীদের রোমান্টিক, জঙ্গী ও ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানবাদী ও গঠনমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবের পর্য্যায়টি ছিল নঞর্থক পর্য্যায়। কঁত বলেন, ঐ নঞর্থক পর্য্যায়কে অতিক্রম করে আধুনিক শিল্প সমাজের Positive বা বিজ্ঞানবাদী স্তরে সদর্থক শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্বকে আহ্বান করা যাবে।

৩.৪.১ বিজ্ঞানবাদী দর্শন (Positive Philosophy)

বিশিষ্ট ভাষ্যকার লেসজেক্ কোলাকয়স্কি (Leszek Kolakowski) বলেন, গত দু'শ বছর ধরে বিজ্ঞানবাদ (দৃষ্টবাদ) এত বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করেছে যে নির্দিষ্ট একটি কোন বিজ্ঞানবাদী (বা দৃষ্টিবাদী) দার্শনিক ঐতিহ্যের কথা না বলাই শ্রেয়। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় (thing), প্রস্তাব (propositions) এবং সিদ্ধান্ত (generalizations) থাকে যা সেই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ও সমালোচকদের কাছে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও স্বীকৃত। বিজ্ঞানবাদের ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ কিছু স্বীকৃতি ধারণা ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমতঃ বিজ্ঞানবাদ (পজিটিভিজম্) সত্তা এবং তার বাহ্যমূর্তির (বা আকৃতির) মধ্যে কোন পার্থক্য করতে চায় না। তাই এটা একপ্রকার প্রপঞ্চবাদ বা Phenomenalism-এর মত। প্রপঞ্চ এবং সত্তার মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ নেই (no real difference between phenomenal apperanance and essence)।

বিজ্ঞানবাদীরা বলবেন, অভিজ্ঞতায় যা প্রতিভাত, যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কেবল সেটাই আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি, কেবল তারই বিচার বিশ্লেষণ চলতে পারে। এই হিসাবে পজিটিভিজম্ বা বিজ্ঞানবাদ যাবতীয় অধিবিদ্যামূলক (Metaphysical) ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য সত্তা ও প্রপঞ্চের মধ্যে প্রভেদ না করলেও বিজ্ঞানবাদীরা এটা মানেন যে প্রকাশিত বিষয় এবং তার অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। যেমন বলা যেতে পারে কোন রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালান। তবে ইন্দ্রিয়াতীত, অতিপ্রাকৃত, রহস্যপূর্ণ, সাধারণের অজ্ঞাত, বিশেষ গূঢ় কোন কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞানীদের সমর্থন করেন না।

বিজ্ঞানবাদীরা যেমন সবকিছুর মূলে কোন Spirit বা মহাচৈতন্যের উপস্থিতি মানবেন না, তেমনি কোন Essential Matter বা তথাকথিত বিশুদ্ধ অজেয় বস্তুসত্তাকেও তাঁরা সবকিছুর মূল বলে গ্রহণ করেন নি। বরং তাঁরা গোঁড়া ভাববাদের মত গোঁড়া বস্তুবাদ এর মধ্যেও অধিবিদ্যাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানবাদীরা একপ্রকার Nominalism বা সংজ্ঞাবাদ মেনে চলেন। সংজ্ঞাবাদ বলে, আমাদের সাধারণ ধারণাগুলি নামপদ বা শব্দমাত্র। সংজ্ঞাবাদ অনুসরণে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, কোন নির্দিষ্ট মূর্ত (concrete) বাস্তব ব্যাপারে ভিন্ন অন্য কিছুর প্রসঙ্গে কোন ধারণা বা উপলব্ধিকে সাধারণ জ্ঞানের আকারে (General proposition) সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বিজ্ঞানবাদীরা প্লেটোর 'ন্যায়নীতি' (Justice) সংক্রান্ত তত্ত্বকে গুরুত্ব দেবেন না, যেহেতু কোন নির্দিষ্ট, মূর্ত, সমাজব্যবস্থার কথা না বলে একটি বিমূর্ত সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে তাকে হাজির করা হয়েছে। তাই বলে বিজ্ঞানবাদীরা কোন Abstraction বা বিমূর্তায়ন প্রক্রিয়াকে মানেন না এমন বলা যাবে না। তারা কেবল বলবেন ওটা যেন বৈজ্ঞানিক বিমূর্তায়ন (Scientific abstraction) হয়। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তায়নের অর্থ হ'ল অভিজ্ঞতায় হাজির বা প্রত্যক্ষকরণে ফসল স্বরূপ বিষয় ও ঘটনাগুলোকে সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিমূর্ত ধারণা (abstract concept) তৈরী করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ঐ বিমূর্ত ধারণাগুলোর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তারা কেবল বাস্তব বিষয়ের গবেষণার সাহায্যকারী মাধ্যম (means) মাত্র।

তৃতীয়তঃ, পজিটিভিজম্ বা বিজ্ঞানবাদ কোন গবেষণা কর্মে পছন্দ-অপছন্দের, ভাল মন্দের বা মূল্যবোধভিত্তিক ধারণাকে প্রাধান্য দেয় না। কোন বস্তু বা কোন ঘটনা সম্পর্কে 'মহান', 'সুন্দর', 'কুৎসিৎ', 'ভালো' ইত্যাদি যে সব বিশেষণ বা গুণাবলী সচরাচর জুড়ে দেওয়া হয়, বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী বাস্তবে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলি নিতান্তই বিষয়ীগত (Subjective) প্রবণতা।

সর্বশেষে, বিজ্ঞানবাদী দর্শনের একটি মৌলিক অবস্থান হ'ল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোর ঐক্যসাধন (The essential unity of scientific methods)। কঁত্ আশা করেছিলেন যে কালক্রমে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ Positive Science গড়ে উঠতে পারে যা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সংঘবদ্ধ করবে। (অনেকে বলেন, অনুরূপ ঐক্যবদ্ধ বিজ্ঞান গড়ে তোলার কোন সম্ভাবনা না দেখে কঁত্ শেষ পর্যন্ত তাঁর Positive Science কে প্রসারিত করেছিলেন Positive Humanism নামক এক সমন্বয়বাদী ধর্মীয় দর্শনে।)

উপরিউক্ত প্রত্যয়গুলির ভিত্তিতে কঁত্ যে সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানবাদ (Sociological Positivism)-এর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তা আজও নানাভাবে সমাজতত্ত্বের গবেষক-পন্ডিত মহলে আলোড়ন তুলে চলেছে। কঁত্ কেবল সাঁ সিমঁ-এর ধারণাগুলো নিজের নামে চালিয়েছেন, নাকি সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানবাদ তাঁর স্বকীয়তা বহন করছে এই বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু ইতিহাসগতভাবে এখনও আমরা কঁত্কেই সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানবাদের আনুষ্ঠানিক পুরোহিত বলেই গণ্য করব।

৩.৪.২ সামাজিক-বৌদ্ধিক বিবর্তনের তত্ত্ব ঃ ত্রিস্তর প্রগতির বিধি

জ্ঞানদীপ্ত যুগের দার্শনিকগণ প্রগতির ধারণাকে উপস্থাপিত করে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সেটা কঁত্ স্বীকার করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকগণ যেভাবে প্রাক্-শিল্পযুগের সমাজের সমগ্র পর্য্যায়টিকে অন্ধকারের স্তর বলে অভিহিত করেছিলেন সেটা কঁত্ গ্রহণ করতে পারেন নি। কঁত্-এর মতে সঠিক বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুকরণ করলে দেখা যাবে যে মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশের প্রতিটি স্তর বা পর্য্যায়েই কিছু বিশিষ্টতা ছিল। সমাজ-ইতিহাসের প্রগতির ধারাটিকে ঐসব বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রম অনুসারে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

Positive Science বা সদর্থক বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কঁত্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতিগুলো অবলম্বন। যেমন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য বিষয়সংক্রান্ত কিছু বিধি বা নিয়মের সন্ধান দান। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বলা যায় সদর্থক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য কঁত্ সমাজ বিকাশের কথা মানুষের বৌদ্ধিক বিবর্তনের একটি ত্রিস্তর বিধির কথা উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) আধ্যাত্মিক বা কাল্পনিক স্তর (Theological / Fictitious stage); (খ) অধিবিদ্যামূলক বা বিমূর্ত স্তর (Metaphysical / Abstract Stage); (গ) বৈজ্ঞানিক / সদর্থক স্তর (Scientific / Positive stage)।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা যায় প্রথমাবস্থায় শৈশবের নানা ভয়-ভীতি সংস্কারের মধ্য দিয়ে, মধ্যবর্তী অবস্থায় কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত নানা ধারণার মধ্য দিয়ে এবং সর্বশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠার পর বাস্তববাদী এবং বিজ্ঞানবাদী মনোভাবের সাহায্য নিয়ে মনুষ্য-ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অনুরূপভাবে সমাজের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে, প্রথমাবস্থায় আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক স্তর, মধ্যবর্তী অবস্থায় দার্শনিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে, প্রথমাবস্থায় আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক স্তর, মধ্যবর্তী অবস্থায় দার্শনিক ভাববাদী ধারা এবং আধুনিক পর্য্যায়ে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ। এক্ষণে ত্রিস্তর বিধিটির বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হল।

(ক) (The Theological or Fictitious stage) ঃ আধ্যাত্মিক বা কাল্পনিক স্তর

আগস্ত কঁত্ বলেন, অতীতের তথা মানুষের প্রাচীন যুগের এই স্তরটিতে সমাজ জীবন-ধারায় পুরোহিত সম্প্রদায় ও সামরিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। এই পর্য্যায়ে অলৌকিক এবং আধিভৌতিক শক্তিগুলো বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলতঃ মানুষের চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞানশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক শক্তিনির্ভর ধারণা এবং তত্ত্বগুলো প্রাধান্য পায়। এই স্তরে মানুষ নানা ধরনের দেবদেবীর কল্পনা করে। এই সময় দেবতাদের উপর মানবিক প্রকৃতি আরোপ করা হয়।

আধ্যাত্মিক স্তরটি আবার তিনটি উপস্তরে (sub-stage) বিভক্ত। এগুলি হল ঃ (১) Fetishism—অচেতন বস্তু বা বিষয়কে ঈশ্বরজ্ঞান করা। (২) Polytheism বা বহু ঈশ্বরবাদ এবং (৩) তৃতীয় ও শেষ উপস্তরটি হল Monotheism বা একেশ্বরবাদ।

(খ) (The Metaphysical or Abstract stage) ঃ অধিবিদ্যামূলক / বিমূর্ত স্তর

এই স্তরটিতেও চার্চ কর্তৃপক্ষের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ধর্মীয় ব্যবস্থাদির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আইনবিদ এবং শাস্ত্রকারগণও এই স্তরে গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। তবে ক্রমশই এই স্তরে বিমূর্তশক্তি ও যুক্তির প্রাধান্য বাড়তে থাকে। Augusta Comte মনে করেন যে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে অর্থাৎ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এর অব্যবহিত পূর্বের শতাব্দী থেকে এই অধিবিদ্যাগত স্তরের সূত্রপাত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই স্তরের আয়ুষ্কাল খুবই কম। কঁত্ বলেন, শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই স্তর নিঃশেষিত হয়েছে। এই স্তরের পরিণত পর্য্যায়ে যেমন জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকদের যুক্তিবাদীতার আবির্ভাব ঘটে তেমনি এই পর্য্যায়ে একপ্রকার রোম্যান্টিক প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় (যেমন রুশোর মধ্যে)। উপরন্তু কঁত্-এর মতে এই অধিবিদ্যার স্তরে বুদ্ধিবাদ, রোমান্টিকতা ইত্যাদি সব কিছুরই শেষ ফসল হল এক নঞর্থক এবং ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া বা নানা গণবিদ্রোহ এবং সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই নঞর্থক প্রকৃতি সত্ত্বেও কঁত্ এই পর্য্যায়টির মূল্য স্বীকার করতে ভোলেন নি। কঁত এই স্তরটিকে— এই অধিবিদ্যাগত পর্য্যায়কে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের স্তর বলে গণ্য করেছেন।

পূর্বেকার আধ্যাত্মিক স্তরটিকে বর্জন করে আধুনিক বিজ্ঞানবাদী স্তরের ভিত্তি রচনা করতেই যেন এই মধ্যবর্তী অধিবিদ্যাগত স্তরের আবির্ভাব। কঁত মনে করেন, এই মধ্যবর্তী পর্য্যায়ে ধ্বংসাত্মক এবং নঞর্থক প্রকৃতিটি এতই প্রকট বলেই মানুষ তার আধুনিক শিল্পসমাজের পর্য্যায়ে সদর্থক বিজ্ঞানবাদী এবং গঠনমূলক (constructive) ক্রিয়াকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিতে পারছে।

(গ) (The Positive or Scientific Stage) ঃ সদর্থক বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সদর্থক বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায়ের সূচনা হয়েছে এ কথা বলা যেতে পারে। এই সময় থেকেই তাত্ত্বিক ধারণাগুলো সদর্থক ধারণা হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এই পর্য্যায়কে বিজ্ঞানবাদী বলার কারণ হ'ল এই যে এই সময় থেকে কল্পনাশ্রয়ী বক্তব্য উপস্থাপিত করার বদলে মানুষ নানাপ্রকার পর্যবেক্ষণও পরীক্ষা ভিত্তিক বক্তব্য হাজির করার চেষ্টা করেছে।

আধুনিক পর্য্যায়টিকে আগস্ত কঁত্ কেবল বিজ্ঞানবাদী পর্য্যায় বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি মনে করেছেন এটাই হ'ল মানবসমাজের বিবর্তনের সর্বোন্নত এবং সর্বশেষ পর্য্যায়। সদর্থক নামে অভিহিত করলেও তিনি পর্য্যায়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কোন সদর্থক ভূমিকার কথা বলেন নি। বলা বাহুল্য এটা কঁত্-এর এলিটবাদী

(Elitist) মনোভাবেরই অনিবার্য ফল। ফরাসীরা যেভাবে জঙ্গী-বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল কঁত্ তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর বরং এরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে জনগণ বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করলে কেবল ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াই সম্পন্ন হতে পারে। অগণিত মানুষ নিয়ে কখনও গঠনমূলক কাজ হয় না।

সদর্থক পর্য্যায়ে সমাজজীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে বিজ্ঞানীরা। কঁত্ অবশ্য বিজ্ঞানী বলতে বিচিত্র কর্ম ও পেশায় নিযুক্ত সমাজের উপর তলার শ্রেষ্ঠাংশকেই বুঝিয়েছেন। এই শ্রেষ্ঠাংশ বা Elite গণ অবশ্যই সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং কঁত্-এর মতে এরাই প্রকৃত গঠনমূলক কাজের উপযুক্ত। এঁদের মধ্যে যেমন গবেষক বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, তেমনি এই গোষ্ঠীতে থাকবেন ম্যানেজারগণ, দক্ষ-কারিগরগণ এবং পরামর্শদাতা আমলাগণ। বিমূর্ত রোম্যান্টিক পর্য্যায়ে যে সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল তাকেই পুনর্গঠিত করার কাজে এই শ্রেষ্ঠাংশ বা এলিট গোষ্ঠী নিজেদের নিযুক্ত রাখবেন।

সমাজ বিবর্তনের উপরিউক্ত তিনটি স্তরের সঙ্গে সমতা রেখে মানবিক মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করা যাবে। কঁত্ বলেছেন আধ্যাত্মিক স্তরে তো বটেই, বিমূর্ত অধিবিদ্যার স্তরেও সাধারণভাবে জঙ্গী সামরিক গোষ্ঠীর মূল্যবোধগুলোই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে কিনা আধ্যাত্মিক স্তরে সামরিক গোষ্ঠীর মূল্যবেধ যেরূপ আগ্রাসী ধরনের ছিল সে তুলনায় বিমূর্ত স্তরে সামরিক মূল্যবোধগুলো অপেক্ষাকৃত স্থিতাবস্থাকামী।

কঁত্ এরূপই অনুভব করেছেন যে তিনি যেন তাঁর চোখের সামনে একটি ব্যবস্থার অবসান এবং অপর একটি ব্যবস্থার আবির্ভাব লক্ষ্য করছেন। তিনি দেখছেন যে আধ্যাত্মিক এবং সামরিক ব্যবস্থাপুষ্ট সমাজগুলো মৃতপ্রায় (Theological Military society was dying)। অন্যদিকে তাঁরই সামনে বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পসমাজ সূর্য্যোদয়ের মত আবির্ভূত। কঁত্ এই আধুনিক সমাজকেই স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এই ভেবে যে পুরোহিত সম্প্রদায় এবং ধর্মপ্রচারকদের সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানী এবং শিল্পগোষ্ঠীর মানুষেরাই সমাজে কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আধুনিক যুগের এলিট্ গোষ্ঠীর মধ্যে Captains of Industry বা শিল্পের কর্ণধারগণই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবেন বলে কঁত্ নির্দেশ দিয়েছেন। মার্কসবাদীগণ এই কারণেই হয়ত কঁত্-এর সমাজতত্ত্বকে একাধারে রক্ষণশীল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থপুষ্ট Ideology বলে অভিহিত করেছেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কঁত্ কৃত সমাজবিবর্তন তথা মানবপ্রগতির তত্ত্বটি Unilinear theory বা একরৈখিক তত্ত্বের দোষেদুষ্ট। মানবসমাজ সর্বত্র যেন একটিমাত্র ছক অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু সব সমাজই যেন অনিবার্যভাবে Positive বা বিজ্ঞানবাদী স্তরের দিকে ধাবিত। এই হিসাবে মানুষের ইতিহাস যেন এক অভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস। এরূপভাবে বিশ্বের মানুষের সমাজ ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে এক সর্বাত্মক ঐক্য বা Unity সন্ধানের যে প্রচেষ্টা আগস্ত কঁত্ করেছেন তাকে পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক ও সমালোচকগণ deterministic বা নিয়ন্ত্রণবাদীতার দোষে দুষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন।

৩.৪.৩ বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্য্যায় (Hierarchy of the Science)

সমাজবিবর্তন এবং মানুষের বৌদ্ধিক ও মূল্যবোধগত বিবর্তনের মতই আগস্ত কঁত্ মানবিক জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর বিবর্তনসংক্রান্ত একইরূপ বিধি বা ধারার কথা বলেছন। কঁত এর মতে মানুষ যেমন তার আদি পর্য্যায়ে

বিজ্ঞানবাদীতা অর্জন করে নি তেমনি তখন মানুষের বিদ্যাচর্চাও ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের। কোন কোন জ্ঞানশৃঙ্খলার তখন জন্মই হয় নি। বলা যেতে পারে মানববিদ্যাগুলো তাদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী এক একটি স্তরে প্রকাশ পেয়েছে।

মানবসমাজের প্রাথমিক স্তরে যে বিদ্যার বিকাশ ঘটেছিল তা হ'ল Astronomy বা জ্যোতির্বিদা। এর কারণ হ'ল, ঐ আদি পর্য্যায়ে মানুষ ছিল কল্পনাশ্রয়ী। রহস্য এবং মোহমায়াজাল বিস্তার করে যে ধরনের কল্পচিত্র এবং অবৈজ্ঞানিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত হাজির করা হ'ত তাতে জ্যোতির্বিদ্যার মত শাস্ত্রের আবির্ভাব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। প্রাচীনকালে আরও একটি শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তাহ'ল Mathematics বা গণিতশাস্ত্র। জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর ক্রমপর্য্যায়ের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি হিসাবে গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তি। অধুনা যে বিজ্ঞানবাদী পদ্ধতি মানুষ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে তার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে গণিতের উল্লেখ করতে হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের পর ক্রমপর্যায়ে যে শাস্ত্রগুলো ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে সেগুলি হ'ল যথাক্রমে Mechanics (বলবিদ্যা), Physics (পদার্থবিদ্যা), এবং Chemistry (রসায়নবিদ্যা)। প্রতিটি বিজ্ঞানই তার পূর্ববর্তী শাস্ত্রটির অগ্রগতির ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করে। এই হিসাবেই জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর একটি Hierarchy বা ক্রমপর্য্যায় তৈরী হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্য্যায়ে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি হ'ল জীববিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা (biology and physiology)। অতঃপর ঐ দু'টি শাস্ত্রকে অতিক্রম করে সর্বাধুনিক এবং সর্বোন্নত শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে বলে কঁত্ দাবী করেন। অর্থাৎ কঁত্-এর মতে আধুনিক সমাজ যেমন সদর্থক (positive) বা বিজ্ঞানবাদী সমাজ, তেমনি সেই সমাজেরই উপযুক্ত জ্ঞান শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজতত্ত্ব একটি Positive science বা সদর্থক বিজ্ঞান।

লক্ষ্য করার বিষয় যে কঁত্ সমাজতত্ত্বের অব্যবহিত পূর্বে biology বা জীববিদ্যার আবির্ভাবের কথা বলেছেন। কঁতীয় সমাজতত্ত্বে জীবনবিদ্যামূলক ধারণাগুলোর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে। অনেকে বলেন, Anatomy ও Physiology-এর মধ্যে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, সেটা অনুকরণ করেই যেন কঁত্ সমাজ কাঠামো (Structure) এবং সামাজিক ক্রিয়ার (Function) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এছাড়া কঁতীয় তত্ত্বে Statics বা স্থিতিবিদ্যার সঙ্গে Dynamics বা গতিবিদ্যার পার্থক্য এবং Social order বা সামাজিক স্থিতাবস্থার সঙ্গে Social progress বা সামাজিক প্রগতির যে ব্যবধান নির্দিষ্ট হয়েছে সে সবই ঐ জীববিদ্যামুলক সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত।

কঁত্-এর মতে আধুনিক শিল্পসমাজের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে যেমন পূর্ববর্তী অধিবিদ্যাগত নঞর্থক স্তরের অবদান রয়েছে তেমনি আধুনিক শাস্ত্র সমাজতত্ত্বের মত বিজ্ঞানবাদী সদর্থক বিদ্যাটির পটভূমি রচিত হয়েছে পূর্বোল্লিখিত জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর ক্রমপর্যায়ের মধ্য দিয়ে—বিশেষতঃ এক উন্নত পর্যায়ে Biology বা জীববিদ্যার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

পদ্ধতির কথা বিবেচনা করেও জ্ঞানশৃঙ্খলাগুলোর ক্রমপর্যায় উপলব্ধি করা যায়। লক্ষ্য করা যাবে Biology-র পর থেকে Sociology বা সমাজতত্ত্ব পর্যন্ত একটি সমগ্রতাবাদী বা Holistic দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছে। আগের বিজ্ঞানগুলো ছিল মূলতঃ বিশ্লেষণাত্মক বা Analytical। উন্নততর পর্যায়ে Synthetic বা সংশ্লেষনাত্মক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছে। এই সংশ্লেষনাত্মক পদ্ধতি গড়ে ওঠার পর্যায়ে Holistic Approach বা সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। জীবদেহকে যেরূপ পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব হিসাবে বিচার করা প্রয়োজন, সেইভাবে মানবসমাজকেও

একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। জীববিদ্যার শিক্ষার ভিত্তিতেই প্রথম কঁত্ এবং পরবর্তীকালে স্পেনসার (Spencer) এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে সমাজদেহটিও একটি organic unity বা গঠনতান্ত্রিক সংহতি। এই গঠনতান্ত্রিক (বা জীবদেহমূলক) সংহতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কঁত্-স্নেপসার (অন্য এক অর্থে ডুর্খাইমও) বোঝতে চেয়েছেন যে সমাজের কোন অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে যাওয়া অনুচিত ও অযৌক্তিক। কঁত্ এর ভাষায়, ''There can be no scientific study of society...if it is separated into portions.'' এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রগতিমূলক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ এবং মানবিক বিদ্যাগুলোর বিকাশের যে তত্ত্ব আগস্ত কঁত্ হাজির করেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এক উচ্চ পর্যায়ের মানবিক ঐক্যের কথা ঘোষণা করা। বিশষ্ট লেখক রেমন্ড অ্যারন তাই বলেছেন, ''Auguste Comte may be considered as, first and foremost, the sociologist of human and social unity'' বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে, বিশেষতঃ সমাজবিকাশের স্তর এবং বিজ্ঞানগুলোর বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে, তিনি মানুষের এই সার্বিক সামাজিক ঐক্যের পথনির্দেশ করতে চেয়েছেন।

৩.৪.৪ সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা

মনুষ্য সমাজের বিকাশ তথা সমাজপ্রগতির কথা বলতে গিয়ে আস্ত কঁত্ দুটি বিশ্লেষণ ধারার উল্লেখ করেন। একটি হ'ল সামাজিক স্থিতিবিদ্যা (Social Statics), অপরটি হ'ল সামাজিক গতিবিদ্যা (Social Dynamics)। সামাজিক ভারসাম্য এবং সামাজিক স্থিতাবস্থার (Social order) প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে যখন নির্দিষ্ট একটি সময় বা কালের নিরিখে সমাজের অস্তিত্বের শর্তাবলী উল্লিখিত ও আলোচিত হয় তখনই তাকে সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলে। একটি সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিধি এবং তার অনুসন্ধান কর্মকেই সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলা হয়ে থাকে।

বিপরীতভাবে সামাজিক গতিবিদ্যা বলতে বোঝান হবে সামাজিক ঘটনাবলীর অবিরাম বিচলন সংক্রান্ত, সামাজিক বস্তুসত্যের গতিময়তা সংক্রান্ত, বিচার বিশ্লেষণ। এক অর্থে বলা যায় গতিবিদ্যা হ'ল সমাজ প্রগতি সংক্রান্ত তত্ত্বালোচনা। কঁত্ বলেন, মাবসমাজের যে প্রকৃত বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞান তার প্রধান লক্ষ্য হবে সামাজিক স্থিতি ও সমাজ-প্রগতি সংক্রান্ত বিধিগুলো আবিষ্কার করা। স্থিতি ও প্রগতি উভয়ে মিলেই সমাজ জীবনধারা। সামাজিক স্থিতাবস্থার আলোচনা করে সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজের অস্তিত্ববজায়কারী নানা উপাদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারেন। আবার সামাজিক প্রগতির আলোচনা করে সমাজজীবনের নানা আন্দোলন এবং পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। তাই এই দু'ধরনের আলোচনা-অধ্যায়নই সমাজ-জীবনধারা অনুধাবন করার জন্য জরুরী।

প্রগতি হ'ল সমাজ বিকাশের পরিচয় বহনকারী। আবার স্থিতাবস্থা হ'ল সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোর মধ্যে একটা স্থায়ী সঙ্গতি। প্রগতির সন্ধান দেয় যে সামাজিক গতিবিদ্যা সেটা অবশ্য সামাজিক স্থিতিবিদ্যার অধীনস্থ বিষয়। যাই হোক্ সমাজতত্ত্ব বিকাশ লাভ করবে এ দু'ধরনের বিদ্যারই সফল প্রয়োগে।

সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের বিধি আবিষ্কার ও বিশ্লেষণই হ'ল সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য। কঁত্ বলেছেন পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যেই বিশ্লেষণ পরিচালিত হবে। আবার উক্ত পদ্ধতি দুটি নিয়ন্ত্রিত হবে স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী। অ্যারন বলেন, কঁত এখানে স্থিতিবিদ্যা বলতে নির্দিষ্ট একটি

সমাজের কাঠামো অনুধাবন করার কথা বলেছেন। আর গতিবিদ্যা বলতে বোঝান হয়েছে ইতিহাসের প্রধান রূপরেখাগুলো উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টাকে। উভয় ক্ষেত্রেই সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে, ইতিহাসের সামগ্রিক ধারাকে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করেই আংশিক পর্যবেক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করা হবে। কঁত্ যাকে সামাজিক মতৈক্য বলেছেন সেই অবস্থাটি, সেই স্থানটি, ব্যাখ্যা করার কাজকেই Statics বা স্থিতিবিদ্যা বলা হচ্ছে। মতৈক্য, সঙ্গতি (Consensus, harmony) ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে দিয়ে কঁত্ সমাজের মৌলিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার কাজকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাই সামাজিক স্থিতিবিদ্যা বলতে যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের কাঠামোটি বিচার-বিশ্লেষণ করার কাজকে বোঝান হবে তেমনি আবার সংহতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সহায়ক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করার দায়িত্বকেও নির্দেশ করা হবে।

গতিবিদ্যা বলতে প্রধানতঃ বোঝান হয়েছে মানবসমাজের বিকাশের স্তর পরম্পরার ব্যাখ্যা বর্ণনাকে। এটা কেবল কেতাবী ইতিহাস রচনার কাজ নয়, সমাজতাত্ত্বিক যখন সামাজিক গতিবিদ্যার চর্চায় নিযুক্ত তখন তাঁর দায়িত্ব ঐতিহাসিকের তুলনায় কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন। কেননা সমাজতাত্ত্বিককে প্রতিটি স্তর পৃথকভাবে বিচার করে দেখতে হবে, জানতে হবে নানা জটিলতা এবং সমস্যাসঙ্কুল সমাজ প্রবাহের মধ্য দিয়ে কিভাবে মানুষের মন এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলির বিকাশ ঘটেছে।

গতিবিদ্যা থাকবে স্থিতিবিদ্যার অধীনস্থ হয়ে। কারণ সব সমাজেই একটা মৌলিক স্থিতি (order) বজায় রাখার কাজ থাকে। স্থিতি বজায় রাখার মধ্য দিয়েই প্রগতি সুনিশ্চিত করা যায়। স্থিতি ও প্রগতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিজ্ঞানবাদীদের (Positivists) অন্যতম প্রতিজ্ঞা (motto) হিসাবেই বিবেচিত হবে। স্থিতির বিকাশ প্রক্রিয়াই হল প্রগতি (Progress is the development of order)। কঁত্ মনে করেছিলেন, একপ্রকার অনিবার্য গতি নিয়েই মানবসমাজ ঐক্য ও সংহতিমূলক প্রগতির দিকে ধাবমান।

৩.৪.৫ সদর্থক মানবতাবাদ ও ধর্ম

আগস্ত কঁত্ মানবতাবাদ ও মানবিক ঐক্যের সমাজতত্ত্ববিদ্। অ্যারন বলেছেন, তিনি ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে সমাজতত্ত্ববিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে দার্শনিক। তাঁর দর্শন সদর্থক মানবতাবাদী দর্শন। শেষ জীবনে তাঁর সমাজদর্শন এক ধরনের মানবধর্মপ্রচারের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সমাজের বিশেষজ্ঞদের, প্রযুক্তিবিদ্, শিল্পবিশেষজ্ঞ, শিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচালন বিশেষজ্ঞ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্দের। এঁরা সকলে সমাজগঠনের কাজে এগিয়ে আসবেন এরূপই ছিল তাঁর প্রত্যয়। উপরন্তু কঁত্ মনে করেছেন ওই গঠন কর্মটি হবে তাঁর সদর্থক মানবতাবাদী দর্শনেরই প্রকাশ। তাঁর মানবতাবাদী দর্শন মানবিক ঐক্যের কথা বলে। আর এই ঐক্যের প্রসঙ্গটি কঁত্-এর রচনায় দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছে।

সমাজের সঙ্কট মোকাবিলায় বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে কঁত্ বিশ্বাস করতেন না। দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বদলে তিনি ধীরগতিতে সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে পরিবর্তন সাধনের কথা ভেবেছেন। উপরন্তু কঁত্ এক ধরনের ধর্মতাত্ত্বিক প্রত্যয় নিয়ে বলেন মানুষ বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই অনেক বেশী অগ্রসর হতে পারবে। সন্দেহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে নয়, বিশ্বাস রাখার মধ্য দিয়েই মানবিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত হবে। যাই হোক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলির সংশ্লেষাত্মক প্রক্রিয়া চালু রাখার মাধ্যমে যেমন তিনি সর্বোচ্চ মানববিজ্ঞানে পৌঁছতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে এক মানবধর্মের (religion of humanity)

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উপস্থাপিত করতে। অ্যারন জানিয়েছেন, কঁত্-এর মতে আজকের দিনের ধর্ম হবে সদর্থক (বিজ্ঞানবাদী) উদ্দীপনায় বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত।

মনে রাখতে হবে কঁত্ যে মানবধর্মের উপস্থাপনা করেছেন তাতে একটা মৌলিক মানবতার (Essential humanity) কথা উচ্চারিত হয়েছে। আর এই মৌলিক মানবতার অবশ্যই কোন লোকায়ত চরিত্র তিনি নির্দেশ করেন নি। বরং তিনি বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষের আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছেন, যাদের কাজ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উদাহরণস্বরূপ মনে হয়েছে। এইসব মানুষের জীবন ও কর্মের মধ্যে ঐ মৌলিক মানবতার হদিস পাওয়া যাবে। এরূপ বক্তব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে ঠিকই ; কিন্তু এটাও ঠিক যে তাতে সঙ্কীর্ণতাবাদ নেই। কঁত্-এর বিশেষত্ব এবং বিশেষ ঔদার্য্য এখানেই যে তিনি ফরাসী দেশ বা অন্য কোন দেশ তথা সমাজকে পৃথকভাবে নির্দেশ করে কেবল তাকেই ভালবাসতে বা অনুকরণ করতে বলেন নি। তিনি বরং সর্বকালের সব দেশেরই পূর্বোক্ত সদর্থক মানবধর্ম শেষ বিচারে যতই অস্পষ্ট এবং ভাবাবেগপূর্ণ বিষয় বলে প্রতিপন্ন হউক না কেন, তাঁর সমাজতত্ত্বে যে দেশ কাল নিরপেক্ষ মানবিক ঐক্যের আহ্বান রয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

৩.৫ সারাংশ

ফরাসী পন্ডিত মন্তেস্ক্যুকে যদি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার আদিপুরুষ বলা যায় তবে অপর দুই ফরাসী চিন্তানায়ক সাঁ সিমঁ এবং আগস্ত কঁত্কে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার অগ্রদূত বলা যাবে। শিল্পবিপ্লবের পটভূমিতে শিল্পসমাজকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই এঁরা দু'জনে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা করেন। এদের মধ্যে আবার ১৮৩৮ সালে "সমাজতত্ত্ব" নামটি চয়ন করার কারণে আগস্ত কঁত্ 'সমাজতত্ত্বের জনক' বলে অভিহিত হন।

ফরাসী দেশের জ্ঞানদীপ্ত ধারা এবং রোমান্টিক বিপ্লবের দর্শন— উভয়ের প্রভাবেই তৈরী হয়েছিল সাঁ সিমঁ-এর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিদ্রোহ-বিপ্লব বর্জন করে সমাজগঠনের জন্যই মানুষের প্রস্তুত হওয়া উচিত বলে সাঁ সিমঁ মনে করতেন। সাঁ সিমঁ ভবিষ্যৎ সমাজের যে ছবি এঁকেছেন তাতে ধর্মের স্থান দখল করবে বিজ্ঞান। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানবাদী (Positivist) দর্শনের কথা বলেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। সাঁ সিমঁ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদেরও (Utopian socialists) অন্যতম। মেহনতী মানুষের সংগঠিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের কোন ধারণা তাঁর লেখায় পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের দু-একটি রচনায় মেহনতী মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়েছে দেখা যায়। সাঁ সিমঁই প্রথম বুঝেছিলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানের কাজটাই রাষ্ট্র ও রাজনীতির আসল কাজ।

সাঁ সিমঁ ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ হিসাবে দেখেছিলেন। সাঁ সিমঁ-এর ইতিহাসতত্ত্ব কাল মার্ক্সকে প্রভাবিত করেছিল। সাঁ সিমঁ বলেন, প্রত্যেক সমাজের পরিণতি পর্যায়টি তার অবনয়নের প্রথম ধাপকে নির্দেশ করে। যেমন, দশম শতাব্দী নাগাদ সামন্ত ব্যবস্থা একটা পরিণত পর্যায়ে পৌঁছায়। আবার তার পর থেকেই ঐ ব্যবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাটির চূড়ান্ত অধঃপতন প্রকট হয় এবং নতুন সমাজব্যবস্থার (বুর্জোয়া ব্যবস্থা) আগমন হয়।

বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক দিক্টি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রহণ করে সদর্থক সমাজগঠনমূলক ক্রিয়ায় উদ্যোগী হতে। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলেন। বিশেষ করে ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্রগুলোর তরফে একটি অভিন্ন সংগঠন তৈরী করা খুবই জুররী বলে তিনি মনে করতেন।

সাঁ সিমঁ নৈতিক সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এক ধরনের সর্বেস্বরবাদের কথা বলেছেন যেখানে বস্তু ও ভাব মিলে একাকার।

আগস্ত কঁত্ সম্পর্কে অনেকে বলেছেন তিনি নাকি সাঁ সিমঁ-এর যাবতীয় তত্ত্বচিন্তাকে নিজের বলেই উপস্থাপিত করেছেন গুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র ঋণ স্বীকার না করে। কঁত্ কতটা কুম্ভিলক বৃত্তির দোষে দুষ্ট সেই সম্পর্কে আমরা কোন বিতর্ক তুলব না। তবে সাঁ সিমঁ-এর বিজ্ঞানবাদ এবং শিল্পসমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা যে কঁত্-এর অনরূপ তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এতদ্সত্ত্বেও সমাজতত্ত্বের জনক হিসাবে কেতাব মহলে কঁত্-এর কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। বিজ্ঞানবাদ, সমাজ ও মানবমনের বিবর্তনের ত্রিস্তর, সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যা, বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্যায়, সদর্থক মানবধর্ম ইত্যাদি বিবিধ তত্ত্ব ও ধারণা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আগস্ত কঁত্ সমাজ তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

কঁত্ত আশা করেছিলেন ভবিষ্যতে এমন একটি Positive Science বা সদর্থক বিজ্ঞান গড়ে উঠবে যা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সংঘবদ্ধ করতে পারবে। এই ভাবনাকে প্রসারিত করে তিনি Positive Humanism বা সদর্থক মানবতাবাদ নামে একটি সমন্বয়বাদী ধর্মীয় দর্শনও উপস্থাপিত করেন।

আধ্যাত্মিক, অধিবিদ্যামূলক এবং বৈজ্ঞানিক— এই ত্রিস্তর বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করে কঁত্ সমাজ প্রগতির প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। আবার তিনি যে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রগতির পথ সুগম করতে আগ্রহী নন তা একদিকে যেমন তাঁর সদর্থক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে অপরদিকে তা প্রত্যয়িত হয়েছে তাঁর সামাজিক স্থিতিবিদ্যার (Social Statics) ধারণার সাহায্যে।

বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্যায়ের তত্ত্বে তিনি সমাজতত্ত্বকে সর্বাধুনিক এবং সর্বোন্নত শাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পদ্ধতির বিচারে সংশ্লেষাণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে। এতে একটা Holistic বা সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হবে। কঁত্ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী কেননা তিনি শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবসমাজের জন্যই একটি সদর্থক ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

৩.৬ অনুশীলনী

(ক) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(১) পজিটিভিজম্ বা বিজ্ঞানবাদ বলতে কি বোঝায় ?

(২) 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' কথাটির অর্থ কি ?

(৩) 'সামাজিক গতিবিদ্যা' কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

(৪) 'সদর্থক মানবতাবাদ' বলতে কি বোঝায় ?

(খ) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত আলোচনা করুন

(১) সাঁ সিমঁ-এর বিজ্ঞানবাদ (Positivism) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

(২) সাঁ সিমঁ-এর আন্তর্জাতিক ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

(৩) সাঁ সিমঁকে কি অর্থে সমাজতন্ত্রী বলা যায় তা বিশদভাবে লিখুন।

(৪) আগস্ত কঁত্-এর বিজ্ঞানবাদী দর্শনটি ব্যাখ্যা করুন।

(৫) আগস্ত কঁত্ কৃত সমাজবিকাশের ত্রিস্তর প্রগতির বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।

(৬) সামাজিক স্থিতিবিদ্যা ও সামাজিক গতিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(গ) টীকা লিখুন

(১) বিজ্ঞানগুলোর ক্রমপর্যায়।

(২) মৌলিক মানবতা।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Raymond Aron—*Main Currents in Sociological Thought.* (Vol.I)

(২) Irving M. Zeitlin—*Ideology and the Development of Sociological Theory.*

(৩) Lewis Coser—*Masters of Sociological Thought.*

(৪) F. Abraham and J. H. Morgan—*Sociological Thought.*

একক ৪ ❐ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে মার্ক্সীয় সন্ধিক্ষণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ঃ সমাজচর্চায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি
৪.৩.১ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
৪.৩.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
৪.৪ মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শন
৪.৪.১ শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব
৪.৪.২ মূল-কাঠামো এবং উপরি-কাঠামো
৪.৫ মার্ক্সীয় তত্ত্বে উপরিকাঠামো ঃ
৪.৫.১ রাষ্ট্র
৪.৫.২ ধর্ম ও সমাজ
৪.৬ সামাজিক পরিবর্তন ঃ মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা
৪.৭ অনুশীলনী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- সমাজচর্চায় তথা সমাজচিন্তায় কার্ল মার্ক্স যে এক সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন ধারা প্রবর্তন করেছেন সেটা জানা যাবে।
- মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে যে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বোঝান হয় সেই সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।
- সমাজপ্রবাহকে প্রধানতঃ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা করলেই তার জটিলতা ভেদ করে তাকে ঠিকমত অনুধাবন করা যাবে— এই মার্ক্সীয় প্রত্যয়টির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে।
- মার্ক্সীয় তত্ত্বে মূল কাঠামো উপরি কাঠামোর হিসাবে রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র, ধর্ম ইত্যাদির প্রকৃতি মার্ক্স কিরূপ নির্ণয় করেছেন তা বুঝতে পারা যাবে।
- সর্বোপরি মার্ক্স কিভাবে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমাজ বিকাশের উচ্চতর স্তর হিসাবে সমাজতন্ত্রকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সমাজতত্ত্বের মার্ক্সীয় ধারাটির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

৪.২ প্রস্তাবনা

১৮১৮ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত মোট ৬৫ বছরের নাতিবৃহৎ জীবনে এক অতিবৃহৎ কর্মকান্ডের অধিকারী কার্ল মার্ক্স। গত দেড়শ বছরের অধিককাল তাঁর চিন্তা ও কর্ম পৃথিবীর সর্বত্র যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যেভাবে মানুষকে (বিশেষতঃ নিপীড়িত জনগণকে) উদ্বুদ্ধ করেছে, তা অন্য কোন চিন্তানায়কের ক্ষেত্রে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাগুলো যে অমানবিক শোষণের পরিচয় বহন করছে তাকে মেনে না নিয়ে তার আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবা উচিত বলে এবং তার জন্য মানুষকে সংগঠিত করা উচিত বলে মার্ক্স মনে করতেন। মানব ইতিহাসের এক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হাজির করে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক যুগেই সম্পত্তির মালিক শোষক শ্রেণী মেহনতী মানুষদের উপর শোষণ-নিপীড়ন চালিয়েছে। মার্ক্সকে মনে করেন সমাজচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে সমাজবিবর্তনের বিধিটি আবিষ্কার করে শোষণ-নিপীড়নের প্রকৃতিটি অনুধাবন করা যা সমাজ পরিবর্তনের, সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের, যুক্তি ও পদ্ধতি নির্দেশ করবে। সমাজজগৎ ও জীবনকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার তুলনায় তাকে পালটে দেওয়াটাই অনেক জরুরী কাজ বলে মনে করতেন। তাই মার্ক্সকে আর পাঁচজন কেতাবী সমাজতাত্ত্বিকের মত মনে করলে ভুল হবে। বাস্তবিক মার্ক্স নিজেকে কখনও সমাজতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দেননি। তিনি ছিলেন মূলতঃ বিপ্লবী। তবে বিপ্লবের প্রয়োজন তিনি যে সমাজদর্শন ও ইতিহাস দর্শন হাজির করেছেন এবং যেভাবে তাঁর সময়কার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন তাতে একটি ভিন্ন ধরনের সমাজতত্ত্বও প্রকট হয়েছে।

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তা-ভাবনা এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার সূচনা করেছে। সা সিমঁ বা আগস্ত কঁত্ যেভাবে তাদের বিজ্ঞানবাদী (positivist) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সেখানে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি এক নতুন সন্ধিক্ষণ নির্দেশ করে। এই সন্ধিক্ষণের বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন প্রয়াসে বর্তমান এককে কার্ল মার্ক্স ও তাঁর অনুগামীদের রচনা অনুসরণে আমরা কিছু তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। দেখা যাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশে এই মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও ধারণাগুলো অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছে।

৪.৩ কার্ল মার্ক্স (K. Marx) ঃ সমাজচর্চায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজতত্ত্বের 'জনক' আগস্ত কঁত্ তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড় হলেও মার্ক্স ওঁর সমসাময়িক বললে ভুল হবে না। কঁত্-এর লেখার সঙ্গে মার্ক্স কিছুটা পরিচিত হয়েছিলেন, যদিও সমাজতত্ত্ব নামে নতুন একটি জ্ঞানশৃঙ্খলার যে সূত্রপাত হয়েছে এরূপ কোন ধারণা তাঁর ছিল বলে জানা যায় না। কেবল তাই নয়, মার্ক্স কঁত্ সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন না। তিনি হেগেলীয় বৌদ্ধিক পরিমন্ডলে গড়ে উঠেছিলেন এবং ঐ জর্মন বৌদ্ধিক পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করে কঁতীয় ভাবনা-চিন্তাকে তাঁর খুবই নিম্নমানের বলে মনে হয়েছিল। কঁত্ যে দৃষ্টবাদী (বিজ্ঞানবাদী) দৃষ্টিভঙ্গিটি উপস্থাপিত করেছিলেন তা মার্ক্স এর আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিছু বলে মনে হয় নি। বিদ্রূপ করেই মার্ক্স বলেছেন, ''Come's positivisms has nothing psoitive in it'') (অর্থাৎ কঁত্-এর বিজ্ঞানবাদের মধ্যে সদর্থ কিছুই নেই)। এছাড়া কঁত্কে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী বলেও অভিহিত করেছেন কার্ল মার্ক্স। তিনি অভিযোগ করেছেন ঐ সময়ে কঁত্-এর অনুগামীরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নানাপ্রকার বিকৃতি আমদানী করেছেন।

কঁত্ এর মতই মার্ক্স তাঁর ইতিহাস দর্শনের ভিত্তিতে মানবসমাজের বিবর্তনের কথা বলেছেন। বলা যেতে পারে, একটা বিষয়ে উভয়ে অভিজ্ঞ ধারণা পোষণ করতেন। উভয়েই বলেছেন, ইতিহাসের গতিবিধি ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মার্ক্স-এর সঙ্গে কঁত্ বা তাঁর উত্তরসূরীদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বস্তুতপক্ষে কঁত্, স্পেনসার, ডুর্খাইম, হ্বেবার প্রমুখদের রচনার মধ্য দিয়ে যে সমাজতত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে তার সাথে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের কোনও সংযোগসূত্রে আবিষ্কার করা যাবে না। বরং এটাই বলা সঠিক হবে যে মার্ক্সীয় চিন্তা ও দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পূর্বোক্ত পশ্চিমী চিন্তানায়কদের সমাজতত্ত্ব তৈরী হয়েছে। এই কারণেই বোধ হয় বলা হয়েছে, ''The whole of Western sociology is a long debate with the ghost of Karl Markx.'' (সমগ্র পশ্চিমী সমাজতত্ত্বই হল মার্ক্স-এর প্রেতাত্মার সঙ্গে এক দীর্ঘ বিতর্ক)।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে এক কথায় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে অভিহিত করা হয়। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, একটি সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তা (a broad system of thogh) যাকে আলাদা করে কেবল অর্থনীতি, রাজনীতি বা দর্শনের তত্ত্ব বলে বিচার করা ঠিক হবে না। যে কোনও মানবিক জ্ঞানশৃঙ্খলাতেই এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যাবে। সমাজচর্চার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সহজবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা পৃথকভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর ব্যাখ্যা হাজির করব।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জগৎ ও জীবনের গতিপ্রকৃতি দ্বান্দ্বিক সূত্রে বাঁধা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু, তা কোনও জড় বস্তুই হোক্ বা কোন মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণী হোক্, কিংবা মানুষের সমাজের কোন চিন্তা-ভাবনা বা ব্যবস্থা হোক্— এ সব কিছুর মধ্যেই একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান। দ্বন্দ্বই জীবন, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। আর এই দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হ'ল সংঘাত ও মিলনের এক বিরামহীন প্রক্রিয়া। উপরন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব বস্তুগত অস্তিত্ব হিসাবেই প্রকাশমান। এমন কি চিন্তা-ভাবনার বা আচার-ব্যবস্থার যে দ্বান্দ্বিকতা তারও মূল রয়েছে রক্ত-মাংসের মানুষের অস্তিত্বে। চিন্তা-চেতনা অবলম্বনহীন নয়। মার্ক্স বলেন, সত্তা চেতনাকে নির্দ্ধারিত করে (Being determines consciousness। এই বস্তুগত অস্তিত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্যই মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয়।

৪.৩.১ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

মার্ক্সীয় সমাজদর্শনের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে আবার মার্কসীয় চিন্তাধারাকে অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বোঝাবার জন্য ''দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'' নামটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্বান্দ্বিকতা, ঐতিহাসিকতা ও বস্তুবাদীতা এ সবই একসঙ্গে মিলে মার্ক্সবাদকে এক অনন্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রথমেই দ্বান্দ্বিকতার কথা বলা যেতে পারে।

মার্ক্স নিজে তাঁর কোন গ্রন্থে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কথাটি প্রয়োগ করেন নি। রুশ চিন্তানায়ক জর্জ প্লেখানভই (George Plekhanov) প্রথম মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনাকে 'Dialectical Materialism' বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আখ্যায় ভূষিত করেন। অবশ্য মার্ক্স ''Dialectical Materialism'' কথাটি একসঙ্গে কোথাও ব্যবহার না করলেও তার নানা লেখায় শব্দ দুটি পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

Dialectics বা দ্বান্দ্বিকতা বলতে বোঝায় দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়া। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল তাঁর ইতিহাস দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে এক কল্পিত মহাচৈতন্যের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের কথা বলেছিলেন।

হেগেলের মতে, যে কোনও কিছুর বিকাশ ঘটে তার অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতার ফলে। রাষ্ট্রের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যেমন তিনি বলেছেন, তাঁর আদর্শ (প্রুশীয় রাষ্ট্র) রাষ্ট্র ঐ আদি মহাভাব (Giest)-এর দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগত বিবর্তনের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ফসল। কার্ল মার্ক্স এক অর্থে হেগেলের অনুকরণেই তাঁর দ্বন্দ্ববাদ গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মার্ক্স-এর সমাজদর্শন যে বস্তুবাদী কাঠামোতে উপস্থাপিত তা হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত। তাই মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদকে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ-এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি বললে ভুল ববে না। কার্ল মার্ক্স নিজেই তাঁর Das Kapital গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন, ''My Dialectic is the opposite of Hegel's'' মার্ক্সীয় বস্তুবাদ-এর তাৎপর্য অনুধাবন করলে এই বৈপরীত্যটি বোঝা যাবে।

বস্তুবাদ বলতে এমন একটি দার্শনিক মূল কাঠামো বোঝান হয় যেখানে জগৎ ও জীবনের বস্তুময়তাই মূল সত্য। বস্তুময়তা সমস্ত প্রাণ ও ভূতির নির্দশন। মন, চেতনা, ভাবনা, অনুভূতি, আকাঙ্খা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি মানবিক ও জাগতিক বৈশিষ্ট্যাবলী বস্তুময়তারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। একেবারে বিপরীতভাবে হেগেল বলেছেন এই পার্থিব জগৎকে ছাপিয়ে যে শাশ্বত চেতনা (Geist) ও মহাভাবের জগৎ রয়েছে সেই জগৎই হ'ল মূল সত্য। চেতনারই বিভিন্ন প্রকাশ হ'ল পার্থিব জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন রূপ। কার্ল মার্ক্স এই ভাববাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে বস্তুজগতের প্রাথমিক অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ছিল মূলতঃ নেতিবাচক দ্বন্দ্ববাদ (Negative Dialectics)। হেগেলের মতে যে মহাচৈতন্য বা মহাভাবের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ফলে এই পার্থিব জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনশীল নানাবিধ রূপ প্রকাশ পায়, সেই বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হ'ল নেতিকরণের মাধ্যমে পরিবর্তন ও উন্নতি (Development by Negation)। হেগেলের মতে যে কোনও বিদ্যমান জীবনের (ও জগতের) স্তর হ'ল তার অব্যবহিত পূর্বেকার স্তরের অস্বীকৃতি বা নেতিকরণ। পরদিকে কার্ল মার্ক্স মনে করেন কেবলমাত্র নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি নিয়ে পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়েও হেগেলের ইতিহাস দর্শন শেষ বিচারে অর্থহীন কেননা তা ভাববাদের খোলস এবং নেতিকরণ প্রক্রিয়ার অবাস্তবতা বর্জন করতে অপারগ।

কার্ল মার্ক্স ইতিহাসকে মানুষের নানা কর্মকান্ডের ইতিহাস হিসাবে বিচার করে বলেছেন সমাজবদ্ধ মানুষের প্রধান কর্মকান্ড হ'ল উৎপাদন ক্রিয়া। উৎপাদন কর্মের অনিবার্য দ্বান্দ্বিক রূপটি হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংঘাত [পরবর্তী পাঠ্যাংশ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর আলোচনায় বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে]। তাই মার্ক্স ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস তাঁদের কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শুরুতেই বলেছেন, ''এযাবৎ মানব সমাজের যত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেছে তাদের সকলেরই ইতিহাস হ'ল শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইতিহাস''। এই দ্বন্দ্ব কেবল নেতিকরণ প্রক্রিয় নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত চললে বাহ্যত মনে হবে একটি শ্রেণী সম্পূর্ণ ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন জয়লাভের পর্য্যায় হ'ল পুরনো স্তরের দ্বন্দ্বগুলোর সম্বলিত ফলস্বরূপ। নতুন স্তরে বিজয়ী শক্তির প্রাধান্য থাকলেও বিজিতদের সারাংশ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ ইংরাজী 'Conflict' অর্থে ব্যবহৃত হবে না। দ্বন্দ্ববাদ এর একটি নীতি যেমন— পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা। আর একটি নীতি হ'ল প্রতিটি বিষয় ও বস্তুতে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধীতা। তৃতীয় নীতিটি হেগেলীয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী অবস্থানকে অস্বীকার করা বা অতিক্রম করার নীতি। সর্বশেষ বিরোধী শক্তিগুলোর মিলন প্রক্রিয়া। মাও-জে-দঙ্ যাকে Struggle and Unity of opposite (বিপরীত শক্তির সংঘাতও মিলন প্রবাহ) বলেছেন সেই নীতিটাই মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে গণ্য।